# জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য
# ও
# সেইফটি দিবস
## ২৮ এপ্রিল ২০১৮

## "সুস্থ শ্রমিক নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন"

অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

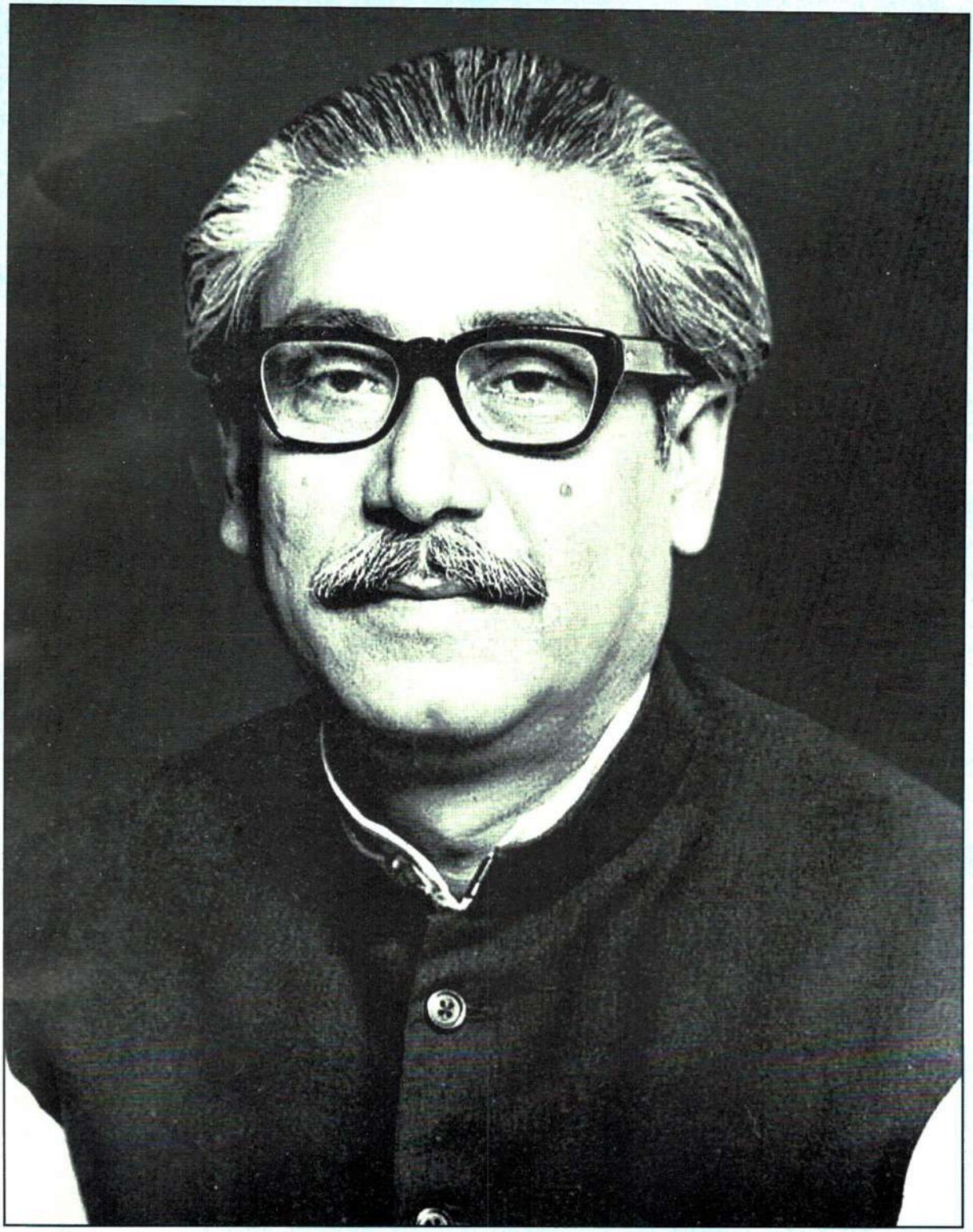

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

**রাষ্ট্রপতি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

# বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৫ বৈশাখ ১৪২৫
২৮ এপ্রিল ২০১৮

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি দিবস' কেবল শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তি। শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। বিশ্ব বাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ, সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ্য শ্রমিক, নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা-বিষয়ক প্রাপ্যতা প্রতিটি শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার লক্ষ্যে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালের ২২ জুন বাংলাদেশ আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সদস্যপদ লাভ করে। স্বাধীনতার পর তিনি সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন এবং বাংলার শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেন। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তবে এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন ও উন্নয়ন অংশিজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সক্ষম হবো- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৮'-এর গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ বৈশাখ ১৪২৫
২৮ এপ্রিল ২০১৮

# বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৮' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। তাই শ্রমিকদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁদের জীবনমান ও কর্মক্ষেত্রের উন্নয়ন আবশ্যক। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, নিরাপদ জীবন- নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। শ্রমিকদের অধিকার এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পরই তিনি সকল কল-কারখানা জাতীয়করণ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে, তখনই এদেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করেছে। আমরা ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে শ্রমিকদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। কর্মক্ষেত্রে শোভন, সুষ্ঠু ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসা ও সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের এসব উদ্যোগের ফলে কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতি ঘটেছে।

বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনি প্রয়োজনীয়তার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রমিকের সুস্থ্য ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে আমি শিল্প-কারখানার মালিক, বিনিয়োগকারী, ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত-সমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৮ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা - জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**শেখ হাসিনা**

# বাণী

**প্রতিমন্ত্রী**
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ বৈশাখ ১৪২৫
২৮ এপ্রিল ২০১৮

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় "সুস্থ শ্রমিক, নিরাপদ জীবন-নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন" প্রতিপাদ্য বিষয় সামনে রেখে এ বছরও 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস-২০১৮' উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেফটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শোভন কর্ম- পরিবেশ সৃষ্টিতে এর ইতিবাচক প্রভাব বিশেষ গুরুত্ববহ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। জাতির পিতার নীতি, আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনকে সামনে রেখে শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাঁদের অধিকার নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার প্রয়োজনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। এরই ধারবাহিকতায় সরকার শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার, মালিক ও শ্রমিক সকল পক্ষের পারস্পরিক সমন্বয় সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে সর্বমহলে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এর প্রায়োগিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ প্রয়াসের সাফল্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

"পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" উদ্‌যাপন-টেকসই শিল্পোন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে ইতিবাচক মননশীলতা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮"-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

**মোঃ মুজিবুল হক,** এমপি

# বাণী

## সভাপতি
বিকেএমইএ

এশিয়ার দ্রুত-বর্ধনশীল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাম্প্রতিক ধারাবাহিকতায় মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথ রচনা করেছে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে অভাবনীয় সাফল্যের পরে, বাংলাদেশের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন। এসডিজি'র জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লক্ষ্য হচ্ছে শোভন কাজের পরিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশগত দিক দিয়ে টেকসই ও নৈতিক উৎপাদন, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, ইত্যাদি। এসকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনার সাথে বেসরকারী খাতসমূহও সরাসরি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী খাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে নীটওয়্যার খাত।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে পোশাক শিল্পখাত হওয়া স্বত্তেও রপ্তানির পরিমান ও দ্রুতপ্রবৃদ্ধি অর্জনে নীটওয়্যার খাতই বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছে ২য় বৃহত্তম দেশ হিসেবে। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম খাত নীট পোশাক শিল্পের চাহিদা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিযোগীতামুলক বিশ্ববাজারে নীটশিল্পের নিজ অবস্থানকে ধরে রাখা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিকেএমইএ বরাবরই গঠনমূলক কাজ করে আসছে। কিন্তু পরপর বড় দুটি দূর্ঘটনা ঘটে যাবার পরে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প যখন বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক চাপ এর সম্মুখীন এবং একই সঙ্গে পোশাকশিল্পের বাজারে একটি অস্থির পরিবেশ বিরাজমান, সেই সময়ে বিকেএমইএ নীটশিল্পের বাজারকে স্থিতিশীল রাখা এবং বৈশ্বিক পরিবেশের আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখার জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদস্য কারখানাগুলোতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আরও ব্যাপকভাকে শুরু করে। এছাড়াও, নতুন সদস্য কারখানা অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে কারখানাতে আইনের মৌলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভবন নিরাপত্তা, অগ্নিনিরাপত্তা এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করে। এছাড়াও বিকেএমইএ নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মপরিবেশে পেশাগত নিরাপত্তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি অকুপেশনাল সেইফটি এ্যান্ড হেলথ ইউনিট (OSH unit) করেছে। এ ইউনিট থেকে কারখানাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যেমন-সেফটি কমিটি গঠন ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি নিহ্নিতকরণ ও সমাধানে সম্ভাব্য করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, কারখানায় সেফটি এ্যাসেসমেন্ট/অডিট, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, নিয়মিত মনিটরিং ও ফলোআপ ইত্যাদি অন্যতম।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে প্রায় দুই কোটি লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। রপ্তানী বাজারে প্রতিযোগী দেশসমূহের অংশগ্রহণের তথ্য বিশ্লেষণ করার সময় আমরা দেখছি একমাত্র বাংলাদেশে মোট রপ্তানির ৮২.৮% শতাংশ আসে এই খাত থেকে। সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব না হলে বাংলাদেশের নীটওয়্যার খাত সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও প্রতিযোগী দেশ সমুহ থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে। যা আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যকে প্রভাবিত করবে তথা সামস্টিক অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

বিন্দু বিন্দু করে নীট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়ে আজকে তা এক সিন্ধুতে পরিণত হয়েছে। সংগঠন হিসেবে বিকেএমইএ বরাবরই সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নীটশিল্প যেন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিজের মজবুত অবস্থান ধরে রাখতে পারে সে বিষয়ে শতভাগ সচেতন। বিকেএমইএ আশা করে যে, বিকেএমইএ'র এ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের নীটশিল্পের সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি শীর্ষস্থান অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ধন্যবাদান্তে

**এ, কে, এম সেলিম ওসমান,** এমপি

# সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

১৫ বৈশাখ ১৪২৫
২৮ এপ্রিল ২০১৮

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩-এর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসারে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২৮ এপ্রিল ২০১৬ সাল থেকে 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে "সুস্থ্য শ্রমিক, নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বরাবরের মতো এ বছরও 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালন করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেফটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দিবসটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নে টেকসই শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হল শ্রমিক-মালিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমজীবী মানুষ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করেছে। মধ্য আয়ের দেশে স্বীয় অবস্থান সুসংহত করেছে। এ অগ্রযাত্রা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও সচেতনতায় আরও বেগবান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিক কালে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চারণের জন্য বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিটি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের কাজ চলছে। পিপিপি-এর মাধ্যমে গাজীপুর ও নারায়নগঞ্জে পেশাগত ব্যাধি নিরসনে ২ টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইনস্টিটিউট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু, মারাত্মক জখম ও বিভিন্ন পেশাগত রোগে আক্রান্ত হবার কারণে একদিকে শ্রমিক পরিবারে যেমন অবর্ণনীয় দুর্ভোগ নেমে আসে অপরদিকে কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়াসহ প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূলত নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব কারখানা মালিকের। সরকার এ বিষয় নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন কার্যক্রম যথেষ্ট জোরদার করেছে। আশা করা যায় অচিরেই দেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ে একটি মানসম্মত অবস্থান সুস্থিতি লাভ করবে।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৮'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আফরোজা খান

# বাণী

## মহাপরিদর্শক

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো "সুস্থ্য শ্রমিক নিরাপদ জীবন, নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয়ভাবে ২৮ এপ্রিল ২০১৮ "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পায়নের এ যুগে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শিল্পকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কর্মস্থলের শোভন ও সাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। Safety first অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার শ্রম আইনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ যুগোপযোগী করে বেশ কিছু সংশোধনী আনয়ন করার পাশাপাশি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর এ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা প্রনয়ন করেছে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মস্থলে সুরক্ষার সাথে একটি দেশের উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকটা জড়িত। সেকারণে মালিক, শ্রমিক, সরকার এর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মস্থলে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন ও বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বর্তমান শ্রমিক বান্ধব সরকার শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক-মালিক-সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হলে কর্মক্ষেত্রে জীবন ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে এবং শিল্পায়ন দ্রুত এগিয়ে যাবে। ১৭ মার্চ ২০১৮ তারিখ জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে প্রবেশের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সামনে দীর্ঘ পথ উন্নত দেশের কাতারে শামিল হবার সময় ২০৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কর্মক্ষেত্র যত বেশি শোভন হবে তত বেশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। আর এ জন্য সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে শ্রমিককে। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে DIFE অঙ্গীকারাবদ্ধ।

**মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া**
মহাপরিদর্শক

# বাণী

## মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও স্মরণিকা প্রকাশিত হবে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করাসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে সকল মহলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন মালিক ও ব্যবহারকারী সকলকে নিরাপত্তা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। আমাদের দেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উঠে এসেছে। এখন সময় এসেছে সকলের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করার পাশাপাশি পেশাগতকাজে নিয়োজিতদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার। এটি শুধু সরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়ন দুরূহ। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক ও যত্নবান হতে হবে। আমি মনে করি, এই লক্ষ্য পূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮ উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোগে বছরব্যাপী পোশাক শিল্প খাতসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে পরিদর্শন, গণসংযোগ, মহড়া, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবহারকারী এবং দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশবাসীর জন্য একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করি।

আমি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল**
**আলী আহাম্মেদ খান,** পিএসসি (অবঃ)
মহাপরিচালক

# বাণী

## সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২৮ এপ্রিল দিনটিকে বিশ্বব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। বাংলাদেশও ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে এবারও দিবসটি পালন করছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গঠনতন্ত্র জাতীয় নীতির ওপর জোর দেয় এবং তাদের প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মীদের পেশাগত অসুস্থতা, রোগ ও আঘাতের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকাকে নিশ্চিত করার কথা বলে। আইএলও'র সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশেও একটি শ্রমনীতি রয়েছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর অধীনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেফটি কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছে।

শিল্পোন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে সারা পৃথিবীতে উৎপাদনের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিনিয়ত সেসব ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন অনেক মানুষ। তারা সফলতার সাথে সেই মাত্রা কমিয়ে আনলেও একদম শূন্যের কোটায় তা নামিয়ে আনা প্রায় অসম্ভবের সামিল। দেশে আইন কাযকর করার জন্য সরকার প্রকৌশলী, ডাক্তার ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি নিয়োগ করছে। কিছুদিন আগে দেশের কলকারখানা পরিদর্শনে গতি আনতে চালু করা হয়েছে লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামের একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। এই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে কারখানা পরিদর্শনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছাড়াও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সনদ দেয়া ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি জানা যাবে। এতো কিছুর পরও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাওয়া ঝুঁকিগুলো থেকেই কর্মক্ষেত্রে মানুষের নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হওয়ার কিছু সুযোগ রয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবি মানুষের নিরাপত্তা ব্যহত হলে তাঁর পরিবারের ক্ষতিসাধন ছাড়াও পরিণামে শিল্পের ব্যয় বৃদ্ধি তথা দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়।

শ্রমিকের ক্ষতি আদতে মানুষের ক্ষতি, তা কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর। উৎপাদনের প্রবহমান ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা যেমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, একই সাথে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে মালিক, শ্রমিক ও সরকার পক্ষকে সমন্বয় রক্ষা করে প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, শিল্পের উন্নয়ন ও শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

আমি পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস ২০১৮ উদযাপনে সাফল্য কামনা করি।

কামরান টি রহমান

# বাণী

**সভাপতি**
বিজিএমইএ

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও ২৮শে এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে সারা বিশ্বে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস আন্তর্জাতিকভাবে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বছর জাতীয়ভাবে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জানতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে আনন্দিত ও গর্বিত।

দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "সুস্থ্য শ্রমিক, নিরাপদ জীবন-নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন"। প্রতিপাদ্য বিষয়টি অবশ্যই জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার বিষয় ও টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি এ মুহূর্তে আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। পেশাগত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি না হলে, নিরাপদ কর্মপরিবেশ না থাকলে কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনাসহ নানাবিধ দীর্ঘমেয়াদী জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ফলশ্রুতিতে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক/কর্মচারীদের সুস্থ ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিতের বিষয়টি ব্যাহত হওয়াসহ জাতীয় জীবনে টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

বর্তমান সরকার শ্রমিকবান্ধব সরকার, বিশেষ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ বিশেষ ভূমিকা রাখছে, যার জন্য তারা অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বাড়বে, ঝুঁকি হ্রাস পাবে ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি গড়ে উঠবে একটি টেকসই উন্নয়ন অর্থনীতি।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প উদ্যোক্তাদের সাহসী বিনিয়োগ এবং ঝুঁকির মধ্যেও উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্প্রসারনের প্রচেষ্টা ও সরকারের শিল্পবান্ধব কর্মসূচির সহযোগিতা নিয়ে গার্মেন্টস শিল্প আজ বিশ্ববাজারে রপ্তানীর পরিসংখ্যান বিচারে দ্বিতীয় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমান বিশ্ববাজারে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর (বায়ার) কমপ্লায়েন্স স্টান্ডার্ড এবং পরিবেশ বান্ধব কারখানা স্থাপন, শ্রম ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন, শ্রম পরিবেশের উন্নতি নানা ধরনের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের চাহিদার কারণে বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরের শিল্প মালিকগণ অনেক বেশী রকমের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এতদসত্বেও এ সেক্টরে উৎপাদনের ধারাবহিকতা বজায় রেখে সরকারের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় মূল শরিক হয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁরা আবদান রেখে যাচ্ছে।

"শ্রমিক শিল্পের প্রাণ" এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কারখানাগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তরিত করা, কমপ্লায়েন্সের উন্নীতকরন, শ্রমিকদের দক্ষতার উন্নয়ন ও কারখানার পরিচালনা সামগ্রিকভাবে কল্যাণমূখী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত শ্রম আইন, বিধিমালা, আই, এল ও কনভেনশন অনুযায়ী বিজিএমইএ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। বিজিএমইএ তার দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়ে গঠিত বিভিন্ন সেলের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, সার্বিক বিবেচনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নিশ্চিতকল্পে শ্রম আইন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার যথাযথ বাস্তবয়ন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করবে।

পরিশেষে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তিতে পোশাক শিল্পখাত থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি" দিবসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

Rahman

**মোঃ সিদ্দিকুর রহমান**

# বাণী

## সভাপতি
রিহ্যাব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিগত সময়ের ন্যায় এবারও পালিত হতে যাচ্ছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস। রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের বৈধ এবং আইনগত অধিকার। শ্রমিকদেরকে একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ প্রদান করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পরিবেশের অনুশীলন প্রতিটি মানুষের কাম্য। এক্ষেত্রে শ্রমিকদেরও সচেতন হতে হবে। অনেক সময় শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য সরঞ্জাম দেওয়া সত্ত্বেও সেটি ব্যবহার করেননা এ বিষয়ে আরো সর্তক হতে হবে।

আমাদের দেশ পূর্বে কৃষি ভিত্তিক দেশ ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে শিল্প-কারখানা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি হয়েছে অসংখ্য নতুন কর্মক্ষেত্র। কিন্তু সমানতালে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পায়নি কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা। এই বিরাট সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে শুধু আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য শ্রমিক, মালিক এবং সংশ্লিষ্ট সবার সঠিক মানসিকতা তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উন্নয়নকে টেকসই করার অন্যতম পূর্বশর্ত।

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর সদস্যবৃন্দ রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে সু-পরিকল্পিতভাবে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা আবাসন সমস্যার সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রিহ্যাব সদস্যদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলাদেশে ঝুঁকিমুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব একটি পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ২৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে সরকারের উন্নয়ন সহযোগি হিসেবে কাজ করছে রিহ্যাব সদস্যরা। আবাসন শিল্পের জন্য দক্ষ শ্রমিক তৈরি ও তাদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে আমরা রিহ্যাব এর পক্ষ থেকে একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে এই সেক্টরের শ্রমিকদের বিভিন্ন ট্রেডে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ নিরাপত্তামূলক পোষাক ও উপকরণ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

শ্রমিক কল্যাণ ও সুস্থ শ্রম পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান লক্ষ্যে সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিভিন্ন কাযক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এসব কর্মপ্রচেষ্টা প্রশংসার দাবিদার। আমরা রিহ্যাব-এর পক্ষ থেকে সরকারের নানামুখী উদ্যোগে প্রতিটি শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা নিশ্চিত হবে, এমন প্রত্যাশা করছি।

**আলমগীর শামসুল আলামিন (কাজল)**

# বাণী

**সভাপতি**
**জাতীয় শ্রমিক লীগ**

কলকারখানার কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধ, শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া ও উদ্ভুত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলো অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসে সেখানকার পাঁচটি পোশাক কারখানার প্রায় ১১৩৭ জন শ্রমিক নিহত হন, যা পেশাগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের সোচ্চার করে তোলে।

বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদার সাথে ২০১৬ সাল থেকে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, শ্রমিক বাঁচলে দেশ বাঁচবে, কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। বর্তমান বাংলাদেশের শ্রমঘন অর্থনীতিতে শ্রমবাজারে শ্রমিকদের ক্রমাগত অংশগ্রহণ বৃদ্ধি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে গঠিত সরকার শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে নানামুখি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। এ অধিকার বাস্তবায়নে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৮" উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

দুনিয়ার মজদুর এক হও।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

**আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ**

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৮

International Labour Organization

# Message

## Officer in Charge
ILO Bangladesh

It is now five years since the collapse of Rana Plaza in April 2013. During this time there has been good progress towards building a culture of workplace safety in Bangladesh. This National Occupational Safety and Health Day 2018 is the ideal occasion to reflect upon what has been achieved and to set our sights on further efforts to make every workplace a safe workplace.

The International Labour Organization with support from Canada, the Netherlands and the United Kingdom has worked closely with the Government of Bangladesh, employers and workers organizations to boost safety in the readymade garment sector.

Through training and education as well as broad awareness campaigns and materials, workers and employers are benefiting from improved safety practices and are better able to fulfil the objectives of the National Action Plan on Fire and Building Safety.

The Capacity of the Department of Inspection for Factories and Establishments has also been greatly enhanced. Playing a front line role to enhance safety and compliance, DIFE has undergone a transformation in terms of staffing, budget and capacity. It now has the stuff and systems in place to support Safety Committees, provide advice and monitor conditions. The success of National OSH Day and the widening involvement of various stakeholders also highlight the progress made.

While much attention has been placed on the garment industry in recent years every worker has the right to safe working conditions. For this reason, I encourage the Government and its regulatory agencies to increasingly focus on other key industries such as leather, construction and ship building. By doing so you will help create a culture of safety that includes all workers.

On this way we should also spare a place in our thoughts for workers who have been injured and the families of those who have lost their lives in workplace accidents. Injuries or fatalities at work can cast families into destitution while impacting the finances and reputation of companies. An Employment injury Protection and Rehabilitation scheme would provide compensation for income loss, healthcare and rehabilitation for all future victims of an injury at work. It will benefit workers and employers alike and therefore should be considered as a matter of priority.

In conclusion, please allow me to highlight the excellent commitment of all those working to improve workplace safety in Bangladesh. For the coming year, let us continue to work together to ensure safe workplace for each and every worker.

**Gagan Rajbhandari**

# সম্পাদকীয়

"সুস্থ শ্রমিক, নিরাপদ জীবন, নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন"-প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবছর তৃতীয় বারের মতো পালিত হচ্ছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮। শ্রমিক, মালিক ও সরকার সবাই কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় উত্তরোত্তর সচেতন হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটিই হলো এ দিবসের মূল চেতনা। প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল সারা বিশ্বে পালিত "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" আমাদেরকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সচেতন করে যায়।

জাতীয় জীবনে এ দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতিপত্র দিয়েছে জাতিসংঘ। বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশ গড়তে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। তাই এসব শিল্পের কর্মপরিবেশ সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ রাখার কোন বিকল্প নেই। জনবহুল এই দেশে ভিশন ২০৪১-এ উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করেই সম্মুখের পানে এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ যেভাবে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে সারাবিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে তেমনি সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে জাতিসংঘের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনেও বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার। জাতিসংঘের নতুন এ লক্ষ্যমাত্রায় শোভন কর্মপরিবেশ, টেকসই উৎপাদন, টেকসই শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চায়। এজন্য বাংলাদেশে পেশাগত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতের বিকল্প নেই।

শ্রমিক ও মালিকগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসের অংশ হিসেবে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে আমরা সচেতনতামূলক স্মরণিকা প্রকাশ করেছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনরত গুণীজনের বাণী, নির্দেশনা ও লেখা এ স্মরণিকায় স্থান পেয়েছে যা বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি রক্ষায় পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বার্ষিক স্মরণিকা প্রকাশে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তথাপি এ প্রকাশনায় নানা অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ত্রুটি বিচ্যুতি ও ঘাটতি বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং পরবর্তী বছরের স্মরণিকার জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কামনা করছি। এই প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় সবাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো এই হোক জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

**এবিএম সিরাজুল হক**
উপসচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি

# বিষয় সূচী


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ০১. সুস্থ শ্রমিক, নিরাপদ জীবন, নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন | ১৯ |
| ০২. নীট শিল্পে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরীতে বিকেএমইএ'র ভূমিকা | ২২ |
| ০৩. বাংলাদেশের আবাসন শিল্প | ২৪ |
| ০৪. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শিশুশ্রম নিরসনে ডাইফ-এর কার্যক্রম | ২৭ |
| ০৫. নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন | ৩১ |
| ০৬. The Role of Occupational therapy in Industrial Settings | ৩৩ |
| ০৭. শিল্প কারখানায় নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ তৈরীর প্রত্যাশায় অগ্নিকাণ্ড রোধে সেইফটি কমিটির কাংক্ষিত ভূমিকা | ৩৯ |
| ০৮. Fire Accident Related Disability: The Experiences of Tazreen Garment Women Workers | ৪১ |
| ০৯. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব | ৪৫ |
| ১০. কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন হতে হবে সবাইকে | ৪৭ |
| ১১. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য | ৪৯ |
| ১২. Understanding of Occupational Safety and Health Management System to create Safety Culture at the Industry level in Bangladesh | ৫২ |
| ১৩. Safe and Healthy Youth Is a Smart Investment for Industries | ৫৬ |
| ১৪. তৈরী পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম | ৫৮ |
| ১৫. কর্মজীবী অন্তঃসত্ত্বা নারীর চাকুরী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা | ৬২ |
| ১৬. দুর্ঘটনা কি, কেন এবং এর প্রতিকার | ৬৫ |
| ১৭. সেফটি কমিটি ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন | ৭০ |
| ১৮. পাথরভাঙা শিল্পে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও নিরাপত্তা | ৭২ |
| ১৯. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি ঃ শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন | ৭৬ |
| ২০. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার ২০১৭ এর জন্য চূড়ান্ত মনোনীত ১০ টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি | ৭৯ |
| ২১. শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তার চেক একজন শ্রমিকের সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা | ৯১ |
| ২২. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত | ৯২ |
| ২৩. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানাও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র | ৯৬ |

# সুস্থ শ্রমিক, নিরাপদ জীবন, নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন

উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান অর্জন করার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।শিল্প খাতের বিকাশ, বিস্তার এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করেছে। প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতি বছর পুরনো রেকর্ড ছাপিয়ে নতুন উচ্চতায় আরোহন করছে। শিল্পের বিস্তার ও বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশে একশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে।ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাণিজ্যের প্রসার ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই "সুস্থ শ্রমিক, নিরাপদ জীবন, নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন"- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শিল্পখাতে শ্রমিকের সুস্থতা নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের প্রয়াস চালাচ্ছে বাংলাদেশ।

মোটাদাগে বাংলাদেশের সামনে এখন লক্ষ্য তিনটি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়া; ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। এই লক্ষ্যগুলো অর্জনে দেশের শিল্পখাত সবচাইতে বেশি অবদান রাখবে এতে সন্দেহ নেই।শিল্পখাতকে যুটুকু স্থিতিশীল রাখা যায়, কারখানার কর্মপরিবেশ যুটুকু নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত রাখা যায় এই খাত থেকে উৎপাদনও বাড়বে সে অনুপাতে । শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এই লক্ষ্য অর্জনে দুর্বার গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের কারখানা, দোকান এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত এবং নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখভাল করে শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনে কাজ করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের সামষ্টিক উন্নয়নে অবদান রাখছে এই অধিদপ্তর। শ্রমিক, মালিক এবং সরকারের সমন্বয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ডাইফ।

১৭ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতিপত্র দিয়েছে জাতিসংঘ। এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ভংগুরতা এই তিন সূচকের সব ধাপ সফলভাবে অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে এই উত্তরণ দেশের জন্য মাইলফলক। দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, শ্রম আইন যুগোপযোগিকরণ, ন্যূনতম মজুরি পুন:নির্ধারণ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ কে যুগোপযোগি ও আরো শ্রম বান্ধব করার লক্ষ্যে ২০১৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাপক সংশোধন করা হয়েছে এবং শ্রম আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ২০১৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৪ খৃষ্টাব্দে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ করা হয়। দেশে শিল্পঘন এলাকায় ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে ৯টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ১৪টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করতে পর্যাপ্ত যানবাহনসহ আধুনিক অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। শ্রমিকদের সু-চিকিৎসার জন্য নারায়ণগঞ্জ এবং টঙ্গীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মানের কাজ চলছে। দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকগণের চিকিৎসা প্রদানসহ শ্রমিক

পরিবারের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার্থে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করতে কার্যকর করা হয়েছে 'জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল'।
পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। পোশাক কারখানায় সংঘটিত কিছু দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রপ্তানীমুখী পোশাক কারখানাসমূহের ভবনের স্থায়িত্ব, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিয়ে দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল। কারখানাসমূহে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রিলিমিনারি অ্যাসেসমেন্ট-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ইউরোপিয়ান ক্রেতা জোট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অ্যাকর্ড, উত্তর আমেরিকান ক্রেতা জোট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অ্যালায়েন্স এবং বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগ-এর মাধ্যমে এবং আইএলও-এর আর্থিক সহযোগিতায় ২০১৩ হতে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৭৮০টি তৈরী পোশাক কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করে। কারখানার কাঠামোগত ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে ভবনসমূহকে চারটি ক্যাটাগরিতে (লাল, অ্যাম্বার, হলুদ ও সবুজ) ভাগ করা হয়েছে। সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ (লাল চিহ্নিত) কারখানাসমূহের ঝুঁকি পুণরায় পরীক্ষণের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শককে আহবায়ক করে বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি রিভিউ প্যানেল গঠন করা হয়েছে। রিভিউ প্যানেল কর্তৃক পরিদর্শিত ৩৭৮০টি কারখানার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৬৩টি লাল চিহ্নিত ভবন পরিদর্শন করে ৩৯টি কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ এবং ৪৭টি কারখানা আংশিক বন্ধ ঘোষণা করে।

জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত ১৫৪৯টি কারখানায় সংস্কার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও সংস্কার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০১৭ সালে সংস্কার সমন্বয় সেল (RCC) গঠন করা করা হয়। বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলো রিমেডিয়েশন কাজ আরসিসির তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হচ্ছে।
কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম অধিকতর মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগি করার লক্ষ্যে পরিদর্শকগণকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। অধিদপ্তরের নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জুন' ১৭ পর্যন্ত ৬টি ব্যাচে মোট ২৩৮ জনকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ডাইফ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৩টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ৭৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও সেইফটি স্ট্যান্ডার্ড বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ধ্যুন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০৮টি প্রশিক্ষণের আওতায় মোট ২২ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।এছাড়া ইতালীর তুরিনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ দূর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, জার্মানী, কানাডা এবং নেদারল্যান্ডস এর সহযোগিতায় এসব দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

অধিদপ্তরের সেবাকে জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সেবা সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গাজীপুরে অবস্থিত অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এর পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আগে যেখানে ১১ টি ধাপে কারখানার লাইসেন্স পেতে লাগত ৯০ দিন সেখানে নতুন পদ্ধতিতে ৯ টি ধাপে সময় লাগছে ৪৫ দিন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটুআই প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত সাপ্তাহিক রাংকিং-এ ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগি করা এবং পরিদর্শন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং পরিদর্শকদের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপটিকে ব্যবহার উপযোগি করতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা

হয়েছে।এই অ্যাপ ব্যবহার করে পরিদর্শনে ডিজিটালাইজেশনের জন্য পরিদর্শকগণকে ইতোমধ্যে ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে।পরিদর্শন কার্যক্রমের তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে এই অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আইএলও এর সহযোগিতায় খাতভিত্তিক মালিক এবং শ্রমিকগণের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৩৩টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা পরিচালনা করা হয়েছে। কারখানায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী সেইফটি কমিটি গঠন ও তা কার্যকর করার জন্য নিয়মিত মালিকপক্ষকে সহযোগিতা করছে ডাইফ। আইএলও আরএমজি প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের ভিত্তিতে সেইফটি কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম করে গড়ে তোলার কার্যক্রম চলছে।

বিশ্বমানের পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠায় সরকারের সাথে একযোগে কাজ করছে শ্রমিক ও মালিক সংগঠন এবং দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হবে যা ২০২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। সাথে সাথে ২০৩০ খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘ নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ খৃষ্টাব্দে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে।

কলকারখানাগুলোয় OSH চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য সরকার নিম্নোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে:

- একটি OSH গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা;
- সকল কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন নিশ্চিত করা;
- দুর্ঘটনা বিমা ও পুনর্বাসন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
- কারখানায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস/সপ্তাহ উদযাপনে উদ্বুদ্ধ করা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় দেশের সকল কারখানায় স্বাভাবিক কার্যক্রম হিসেবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি চালু হবে। তখন সকল কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত থাকবে। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা ঘটলেও বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা। কোন শ্রমিক আহত হলেও সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে কর্মক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন থাকবে; কারণ দুর্ঘটনা বিমা চালু হলে পদ্ধতিগতভাবেই আহতের পরিবার ক্ষতিপূরণ তথা ভরণপোষণের ভাতা পাবেন। OSH একাডেমির গবেষণায় পেশাগত ব্যাধি চিহ্নিত হয়ে নিরাময়ের উপায় বের হবে, ফলে আক্রান্ত শ্রমিকদের সুস্থ হবার সম্ভাবনা বাড়বে।

কলকারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সহায়তায় পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার চর্চাস্থায়ী রূপলাভ করবে। ফলে দেশের রপ্তানিমুখী সকল কারখানা সবুজ হয়ে যাবে। আর অন্যান্য কারখানাগুলোতেও শোভন কর্মপরিবেশ বিরাজ করবে। এভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে এবং ২০৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই বাংলাদেশ উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে আত্মপ্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ।

# নীট শিল্পে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরীতে বিকেএমইএ'র ভূমিকা

**এ. কে. এম সেলিম ওসমান, এমপি**

বিকেএমইএ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং বৈশ্বিক আঙ্গিনায় বাংলাদেশের নীট পোশাক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় শতকরা ৩৯.৮২ শতাংশ আসে নীট খাত থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নীট খাত থেকে মোট রপ্তানি হয়েছে ১৩.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি পরিসংখ্যান বিচারে বাংলাদেশের নীটওয়্যার বিশ্ববাজারে দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। নীট খাতের মোট কর্মসংস্থানের সত্তর শতাংশই নারী।

যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের প্রধান নির্ধারক গার্মেন্টস শিল্প। আর গার্মেন্টস এর মূল প্রাণ শ্রমিক। তাই বিকেএমইএ সামাজিক দায়বদ্ধতাকে বিবেচনায় রেখে তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নীটওয়্যার খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমপ্লায়েন্স সুনিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। বিকেএমইএ ২০০৬ সালে কমপ্লায়েন্স সেল এবং ২০০৯ সালে ফায়ার সেইফটি সেল গঠন করে যারা ক্রমাগত শ্রম আইনের বাস্তবায়নের পাশাপাশি কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা, মালিক শ্রমিক সম্পর্ক, গর্ভধারণ ও মাতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা, মজুরি, ওভারটাইম প্রদান, শ্রমিকদের বাসস্থান ও থাকার পরিবেশ উন্নয়ন, সর্বোপরি শতভাগ কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে।

বাংলাদেশের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ২০১৩ সালের পর থেকে বিকেএমইএ, বাংলাদেশ সরকার, আন্তর্জাতিক খুচরা বিক্রেতা এবং ব্র্যান্ড, সুশীল সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে একসাথে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যার ফলশ্রুতিতে নীট শিল্পের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশে পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তামূলক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিকেএমইএ তার সদস্য কারখানাতে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি অকুপেশনাল সেইফটি এ্যান্ড হেলথ ইউনিট (OSH Unit) গঠন করেছে। এ ইউনিটটি থেকে কারখানাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যেমন- কমিটি গঠন, কমিটির সদস্যদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে সম্ভাব্য করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, কারখানাতে এ্যাসেসমেন্ট, অডিট ইত্যাদি অন্যতম। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, নিয়মিত মনিটরিং ও ফলোআপ ইত্যাদি।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে বিকেএমইএ'র সিনিয়র প্রশিক্ষকগণ

বিকেএমইএ অকুপেশনাল সেইফটি এ্যান্ড হেলথ ইউনিট (OSH Unit) এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

এই প্রকল্পের আওতায় বিকেএমইএ থেকে ৪৩ জন কর্মকর্তা আইএলও এর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে যারা পরবর্তীতে ৩৫৮০ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা, সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষক হিসেবে তৈরী করেছে। পরবর্তীতে উক্ত ৩,৫৮০ জনের মাধ্যমে ৩,৫৮,০০০ জন শ্রমিককে পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য ৪০টি কারখানায় সেইফটি কমিটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রেতাগোষ্ঠি কেবলমাত্র পোশাক ক্রয় করার সময় শুধু পন্যের দক্ষতা নয়, পন্য তৈরীর সাথে জড়িত তথা নৈতিকতা, কমপ্লায়েন্স এর মানদন্ডও বিবেচনায় রাখে। কারখানাগুলোতে নিরাপত্তা উন্নয়ন করলে বহি:বিশ্বে আমাদের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ক্রেতাগোষ্ঠি আমাদের থেকে পন্য ক্রয় করতে আগ্রহী হবে। কারখানাগুলোতে কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করলে শ্রমিকরা তাদের সম্পূর্ণ দক্ষতা দিয়ে কাজ করতে পারবে এবং কারখানাগুলোতে দক্ষ শ্রমিকের অংশগ্রহন বাড়বে। যার ফলে উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে এবং বিশ্ববাজারে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের উত্তরণে ও ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে নীট পোশাক শিল্প। বাংলাদেশ বিশ্বে নীট পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় হলেও বিশ্বের নীট রপ্তানিতে শেয়ার মাত্র ৬ শতাংশ। তাই বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের নীট পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন দক্ষ শ্রমশক্তি। নীট শিল্পে বর্তমানে ২০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মোট ৭ কোটি শ্রম শক্তি রয়েছে, যার অধিকাংশ অদক্ষ। এই বিপুল জনশক্তিকে দেশের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে উৎপাদন কাজে লাগানো দরকার। নীট খাত বাংলাদেশে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবে।

বিকেএমইএ শ্রমিকদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। আমরা বিশ্বাস করি, নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্ম পরিবেশ শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বহুগুনে বাড়িয়ে দেয়। নীট খাতের কারখানা সমূহ নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখলে শিক্ষিত জনশক্তি পোশাক শিল্পে তাদের ক্যারিয়ার তৈরীতে উৎসাহিত হবে। বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যগুলোকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেমন অগ্নি নিরাপত্তা, নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস। বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য অনুযায়ী সকলের জন্য সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে হবে এবং অষ্টম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করার পাশাপাশি সকলের জন্য নিরাপদ এবং শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই পরিবেশ ও সমতা ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। বিকেএমইএ বাংলাদেশ সরকারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এই লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

# বাংলাদেশের আবাসন শিল্প

**নুরুন্নবী চৌধুরী (শাওন), এমপি**
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব

সব মানুষের স্বপ্ন থাকে সুন্দর একটা বাড়ি করার। সারা দিনের ক্লান্তি শেষে ঘরে ফিরে সবাই চায় একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সবারই ন্যূনতম চাওয়া একটা সুন্দর ফ্ল্যাট তথা নিজস্ব ঠিকানা। মানুষের ৫টি মৌলিক চাহিদার অন্যতম হল বাসস্থান। প্রতিটি মানুষের যথোপযুক্ত বাসস্থান পাওয়ার অধিকার জাতিসংঘের ঘোষণা থেকেও প্রমাণিত। আমাদের সংবিধানও বাসস্থানকে মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নিজের একটা বাসস্থান মানুষের স্থিতিশীলতা, আত্মমর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশে জমির তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে বাসস্থানের সংকট প্রকট। বাসস্থান সংকট মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি অধিকতর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর সম্মানিত সদস্যগণ কাজ করে যাচ্ছে। শুধু বাসস্থানের সমস্যা সমাধানই করছে না দেশের অর্থনীতিতেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আবাসন ব্যবসায়ীরা।

নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। স্বাধীনতার পর শুরু হয় দেশ পূনর্গঠন। মানুষের মৌলিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তরাও অংশ নেয় আবাসন খাতের উন্নয়নে। সুপরিকল্পিত এবং সংগঠিতভাবে আবাসন খাতকে এগিয়ে নিতে ১৯৯১ সালে মাত্র ১১ জন সদস্য মিলে গড়ে তোলেন রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাাদেশ (রিহ্যাব)। স্বাধীনতার পর রাজধানী ঢাকায় জনসংখ্যা কম থাকায় রাজউকের কার্যক্রমও ছিল ছোট্ট পরিসরে। সেই সময় ঢাকায় পরিকল্পিত কোন আবাসন ব্যবস্থা ছিল না। বেসরকারি ডেভেলপারদের অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীতে রিহ্যাব সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজধানী ঢাকায় আবাসন খাতের উন্নয়ন হতে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর ২ লক্ষ ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেছে রিহ্যাব সদস্যরা। রিহ্যাব সদস্যদের কার্যকর ভূমিকায় আকাশ রেখায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি গৃহায়ণ খাতের লিংকেজ শিল্প বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে রিহ্যাব সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো। রড, সিমেন্ট, ইট, রং, টাইলস সহ বিভিন্ন লিংকেজ শিল্পে কর্মসংস্থান হয়েছে বিপুল পরিমান নাগরিকদের। জিডিপিতে অবদান রয়েছে ১৫ শতাংশের উপরে। রিহ্যাব সদস্যদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটি পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা। পরিবেশবান্ধব সবুজ নগরীতে নিরাপদ আবাসনের স্বপ্ন পূরণে রিহ্যাব সদস্যরা দৃঢ় প্রত্যয়ী।

নাগরিকদের সুন্দর ও মনোরম আবাসনের ব্যবস্থা এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরির সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চললেও একটা পর্যায়ে এসে নানা ধরনের সমস্যায় ধাক্কা লাগে আবাসন সেক্টরে। বিশেষ করে ওয়ান ইলেভেনের সময় ব্যবসায়ীদের হয়রানি করার কারণে এই সেক্টরে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে গৃহনির্মাণ খাতে স্বল্প এবং মধ্যবিত্তদের জন্য নির্ধারিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘূর্ণায়মান হাউজিং লোন বন্ধ হয়ে গেলে বড় রকমের ধাক্কা আসে আবাসন খাতে। এছাড়া শেয়ার বাজারে বিপর্যয় এবং সোলার প্যানেল স্থাপন, গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকা, উচ্চ সুদের হার এবং ক্রেতা পর্যায়ে ঋণের অভাব, প্রশ্ন ছাড়া অপ্রর্দশিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ না থাকা, জমির মূল্যের উর্ধ্বগতি, সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যের উর্ধ্বগতি, উচ্চমাত্রার ব্যাংক ঋণের সুদের হার এবং সর্বোপরি ভবনের নকশা অনুমোদনের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আবাসন খাত মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। রেজিস্ট্রেশন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে গ্রাম-গঞ্জ সহ সর্বত্রই জমি বিক্রি হ্রাস পেয়েছে। উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য এই খাতে বিনিয়োগের সুযোগ কমতে থাকে। সরকার আবাসনে অপ্রর্দশিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দিলেও নানা ধরনের শর্তের কারণে সেই

টাকা বিনিয়োগ হয়নি। নীতি সহায়তার মাধ্যমে এই বিপুল পরিমান টাকা দেশের আবাসন খাতে বিনিয়োগ হলে এ খাত যেমন গতিশীল হতো তেমনি অর্থনীতিও এগিয়ে যেত। আবাসন খাতে প্রকল্পগুলো ৩-৪ বছর মেয়াদী হওয়ার কারণে এর উন্নয়ন এবং অবনতি বোঝা যায় ধীরে ধীরে। কয়েক বছর আগের সমস্যাগুলোর প্রভাব এখন মারাত্মক ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে এই খাতে। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হয়েছে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি। এ খাতের প্রধান উপকরণ রডের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে অস্বাভাবিকভাবে। একই সাথে বিভিন্ন কোম্পানির সিমেন্ট এবং ইটের দাম বেড়েছে। রড, সিমেন্ট, ইট ছাড়াও গত ছয় মাসে পাথরসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর দামও বেড়েছে। আমরা মনে করি এই মূল্য বৃদ্ধি আবাসন শিল্প তথা নির্মাণ খাতের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ খাত যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, সেই মুহূর্তে নির্মাণ উপকরণের দাম বৃদ্ধিতে নির্মাণকাজ গতিহীন হয়ে পড়বে। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অনেকেই ইতোমধ্যে নির্মাণকাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। ফলে যথাসময়ে ফ্ল্যাট হস্তান্তর অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। এতে দুর্ভোগে পড়বেন চুক্তিবদ্ধ ক্রেতারা। আমরা মনে করি, সংকট উত্তরণের পথে থাকা আবাসন খাত আবারও বড় ক্ষতির মুখে পড়বে।

বর্তমানে আরো একটি সমস্যা অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিয়েছে তা হল গৃহায়ন খাতে ঋণের সুদহার বৃদ্ধি। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ আলোচনা করে এই খাতের সুদ এক অংকের ঘরে কমিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুদের হার আবারও বাড়াচ্ছে। কয়েকটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমরা অনুসন্ধান করে দেখলাম অধিকাংশ ব্যাংক হোম লোন দুই অংকের ঘরে নিয়ে গেছে। দুই একটি প্রতিষ্ঠানে এই হোম লোনের সুদের হার ১৩-১৪ শতাংশ। ফলে আবাসন খাতে আবারও নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিবে।

আবাসন ছাড়া নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবন যাপন অসম্ভব বিধায় সাধারণ মানুষের জন্যই আবাসন খাতের ঘুরে দাঁড়ানো খুবই জরুরী। উচ্চ রেজিস্ট্রেশন ব্যয় হ্রাস এবং ট্যাক্স হলিডে দিতে হবে আবাসন খাতে। বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই এই খাতে কোন রকম শর্ত ছাড়া অপ্রদর্শিত অর্থ আবাসন সেক্টরে বিনিয়োগের সুযোগ

দিতে হবে। আমরা বিভিন্ন সময় দাবি জানিয়ে এসেছি শুধুমাত্র ক্রেতাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে একটি বিশ হাজার কোটি টাকার তহবিল। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য আবাসন খুব সহজেই সম্ভব যদি সরকারের পক্ষ থেকে সিঙ্গেল ডিজিট সুদের এই তহবিল থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা যায়। এ অবস্থায় আবাসন খাত রক্ষায় সরকারের হোম লোনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

আবাসন সুবিধা যেমন নাগরিকের মৌলিক অধিকার তেমনি স্বাস্থ্য সেবাও মানুষের মৌলিক অধিকার। শ্রমিকদের সুস্থতা ও কর্মক্ষেত্রে ভাল পরিবেশের সাথে উৎপাদনশীলতা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই জন্য শ্রমিকদের একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ খুবই জরুরি। অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র এবং মালিক উভয়ের দায়িত্ব। রিহ্যাব নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য রিহ্যাব ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ইন্সটিটিউটে তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্বুদ্ধকরণ ক্লাসও নেয়া হচ্ছে।

জাতীয় অর্থনীতিকে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান লক্ষ্যে সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর পক্ষ আমরা তাদের এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাই। একই সাথে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮ সফল হোক সেই প্রত্যাশা করছি।

# ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শিশুশ্রম নিরসনে ডাইফ-এর কার্যক্রম

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শিশু মা-বাবার হাসি, শিশু একটা পরিবার ও সেসাথে দেশের ভবিষ্যৎ।
কবি গোলাম মোস্তফা বলেছেন: ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।
বাংলাদেশের সংবিধানে ১৬ বছরের নিম্নের ছেলেমেয়েকে শিশু বলা হয়েছে; কিন্তু ২০১১ খৃস্টাব্দের জাতীয় শিশু নীতি অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচের ছেলেমেয়েকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৩ খৃস্টাব্দে প্রণীত জাতীয় শিশু আইনে শিশুর বয়স ১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এ ১৪ বছরের নিচের ছেলেমেয়েকে শিশু এবং ১৪ হতে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের কিশোর বলা হয়েছে।

বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়স যা-ই নির্ধারণ করা হোক না কেনো পিতা-মাতা সন্তান লালন-পালনের সময় বয়স মাপেন না। পিতা-মাতার কাছে সন্তান কখনো বুড়ো হয় না-সন্তান কর্মক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতা সন্তান লালন-পালন করে থাকেন, যদিও ক্ষোভে মাঝে সাঝে বকা দেন, তা সন্তানের মঙ্গলের জন্যই দিয়ে থাকেন।

এই শিশুকে লালন করা তথা সঠিক পথটি দেখানোর দায়িত্ব প্রথমে মা-বাবার/অভিভাবকের, পরে সমাজের এবং সার্বিকভাবে দেশের তথা সরকারের। যদি সরকার শিক্ষার পরিবেশ গড়ে না দেয় তাহলে শিশুরা কখনই শিক্ষিত হতে পারবে না। আল্লাহর রহমতে আমাদের অর্থাৎ জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার কল্যাণ সরকারের সাথে শিশু বান্ধব সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিফিন প্রদানের পাশাপাশি বৃত্তিও প্রদান করা হচ্ছে; অর্থাৎ অন্ততপক্ষে ক্লাশ ফাইভ পাশ করাতে মা-বাবার কোন খরচ নেই।

তারপরও আমাদের চারপাশে বহু শিশুকে পড়া ছেড়ে কাজ করতে দেখা যায়: রেস্টুরেন্টে,টেম্পুতে, ওয়েল্ডিং শপে, ইত্যাদি; কোথায় নেই?
নিম্নবিত্ত/বিত্তহীন কিছু পরিবারে একটু বেশি উপার্জনের জন্য সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে কাজে লাগিয়ে দেন। এ শ্রেণীর পিতা-মাতাগণ সন্তানের ভবিষ্যৎ না ভেবে তাৎক্ষণিক আয়ের দিকটাই বিবেচনা করেন। এই সন্তান একটি পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করে কারিগরি বিদ্যা অর্জন করলে বিশেষায়িত শ্রমিক হিসেবে বেশি পারিশ্রমিকে কাজ করতে পারবেন। আর বকলম থাকলে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয় না বিধায় সাধারণ শ্রমিক হিসেবে খুব কম পারিশ্রমিকে বিভিন্ন পেশায় কাজ করতে হয়।

শিশুশ্রম' শব্দটি সবারই কম বেশি পরিচিত। 'শিশুশ্রম' মানে শিশুদের মাধ্যমে শ্রম। অর্থাৎ শিশুদের দ্বারা কাজ করানো। কোন শিশুকে অর্থের বিনিময়ে বা অর্থ প্রদান ছাড়াই কোন কাজের জন্য নিয়োগ করা হলে তা শিশুশ্রমের আওতায় পরে।
**শিশু শ্রমের শুরুর কথা:** ১৮শতকের শেষভাগে গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প-কারখানা চালু হলে সর্বপ্রথম শিশুশ্রম চিহ্নিত হয় একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে গৃহযুদ্ধের পর এবং দক্ষিণে ১৯১০ খৃস্টাব্দের পর শিশুশ্রম দেখা দেয় একটি সমস্যা হিসেবে। তখন শিশুরা কাজ করতো কারখানায় শিক্ষানবিশ অথবা গৃহ পরিচারক হিসেবে। কিন্তু তা ক্রমেই শোষণের ভয়ানক রূপ ধারণ করে। শুরু হয় দাস প্রথার ভিন্ন আরেক রূপ। ব্রিটেনে ১৮০২ খৃস্টাব্দে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে আইন করে বন্ধ করা হয় শিশুশ্রম। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও অনুসরণ করা হয় এমন আইন। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশে শিশুশ্রম বন্ধের আইন প্রণীত হলেও

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যকতা আবার পেছন ফেরায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৮ ও ১৯২২ খৃস্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত শিশুশ্রম আইন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসে একটি সংবিধান সংশোধনী পাশ করা হলেও অনুমোদন পায়নি অনেক অঙ্গরাজ্যে। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে প্রণীত প্রথম লেবার স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্টস ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত পেশার জন্য বয়স ধার্য করে ন্যূনতম ১৮ বছর এবং সাধারণ নিয়োগের জন্য ১৬ বছর।

আইএলও'র সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী,বর্তমান বিশ্বের প্রায় ১৬ কোটি ৮০ লাখ শিশু নানাভাবে বিক্রি করছে তাদের শ্রম। এদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত প্রায় সাড়ে ৮ কোটি শিশু। এদের অধিকাংশই দিনের পুরো সময় কাজ করে, এরা স্কুলে যায় না; তাছাড়া খেলার সময়ও পায় না। শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও ঝুকিপূর্ণ শ্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৮৯ খৃস্টাব্দের ২০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুমোদিত হয়। ১৯৯২ খৃস্টাব্দে আন্তজার্তিক শ্রম সংস্থা শিশুশ্রম বন্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয় এবং ২০০২ খৃস্টাব্দ হতে প্রতিবছর ১২ জুন বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশও শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষরকারী দেশগুলোর অন্যতম। সরকার জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

**বাংলাদেশে শিশুশ্রম:** বিবিএসের জরিপ মতে বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮টি খাতে ১৭ লাখের মতো শিশু 'শিশুশ্রমে' নিয়োজিত রয়েছে। এরমধ্যে ১৭ লাখ শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। সবমিলিয়ে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে ২ লাখ ৬০ হাজার শিশু অপেক্ষাকৃত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কর্মে নিয়োজিত রয়েছে বলে বিবিএস এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব শিশুরা হোটেল-রেস্তোরা, ট্যানারি, শিল্প-কারখানা, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিপ ব্রেকিং, পরিবহন, কৃষি, পশুপালন, গৃহকর্ম, নির্মাণ, ইট ভাঙ্গা, রিকশা-ভ্যান চালানো, লোহা কাটা ইত্যাদি কাজ করে। এছাড়াও মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও পাচার, পর্ণোগ্রাফি, যৌনকর্ম ও দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে বহু অবোধ শিশু। এসকল শিশুর একটি বড় অংশ রয়ে যাচ্ছে শিক্ষার বাইরে। আর্থিক কারণেই এরা শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে শিশুশ্রমের সংখ্যা ক্রমশ: কমে আসছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এর পাশাপাশি প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০', 'জাতীয় শিশুনীতি-২০১১' ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫। এসকল আইন, নীতি ও বিধিমালায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কিভাবে শিশুশ্রম নিরসন করা হবে, তা বর্ণিত হয়েছে। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিনোদনের কোনো বিকল্প নেই। শিশুদের সংরক্ষণ, কল্যাণ ও শিক্ষার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এসব কর্মসূচি ও নীতিমালা শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ খৃস্টাব্দের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ খৃস্টাব্দের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়া। সম্প্রতি বাংলাদেশ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে প্রবেশ করেছে। পর্যায়ক্রমে উন্নতদেশের কাতারে উঠতে হলে সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসন করতে হবে। শিশুশ্রম রেখে, ভিক্ষাবৃত্তি বজায় রেখে; সর্বোপরি অপরিচ্ছন্ন থেকে কোন দেশ উন্নত হতে পারে না। চলতে পথে যেখানে সেখানে থু থু ফেলা, কাগজের টুকরো, পানি পান করে বোতল ইত্যাদি ফেলা, ফুটপাথের পাশের ড্রেনে প্রসাব করা বন্ধ করতে হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২১ খৃস্টাব্দের মধ্যে ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং ২০২৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারি-বেসরকারি নানান পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতির গতি বেশ ধীর। অনেকের মতে দারিদ্রতাই এর মূল

কারণ। সাথে যুক্ত আছে অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাব। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। আর এর মাধ্যমে দেশের বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে উঠতে পারে। তবে শিক্ষিত জাতি গঠন করে শিশুশ্রম বন্ধ করা ততটা সহজ না। কারণ, আগে শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে ,পরে শিক্ষিত জাতি গঠন সম্ভব হয়ে উঠবে। আর এজন্য চাই সচেতনতা বৃদ্ধি। দেশের প্রায় প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হল থেকে শুরু করে ক্যান্টিন, ডাইনিং, চায়ের দোকান, রিক্সা, টেম্পু, ওয়েল্ডিং শপ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশুশ্রম বিদ্যমান। কারণ, সবাই অর্থনীতি বোঝে। তাই সংশ্লিষ্ট মালিকগণ কম বেতনে অধিক শ্রম খরিদ করে। অবুঝ শিশু আর অসচেতন অবিভাবকও বোঝে না। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে শিশুদের লাগিয়ে দেয় শ্রমে। সব মিলিয়ে দেখা যায়, জানা সত্বেও শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে একমত হয়ে কাজ করেননা অনেকেই। এখানেও স্পষ্ট হয় শিক্ষা আর সচেতনতা এক নয়। আর তখনই সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ হবে, যখন শ্রমশক্তি টেকসই ও মানসম্মত হবে। আর তা সম্ভব শিশুশ্রম রোধ করে সচেতন নাগরিক ও কর্মঠ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে ৩টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে; চতুর্থ প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

**শিশুশ্রম নিরসনে ডাইফ:মূলত:** ডাইফ শিশুশ্রম নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি ডাইফ নিয়মিত পরিদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণ ও মতবিনিময় সভা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সভা/সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫-এ বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ডাইফ সারা দেশে ১১টি সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সেক্টরগুলো: এ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, সাবান, প্লাস্টিক, কাঁচ, স্টোন ক্রাশিং, স্পিনিং, সিল্ক, ট্যানারি, শিপ ব্রেকিং ও তাঁত। এই ১১টি সেক্টরে মোট ৩৪১টি কারখানায় ৯০৩ জন শিশু সনাক্ত করা গেছে যারা শিশুশ্রমের সাথে জড়িত। এই সংখ্যা কমবেশি হতে পারে; কারণ শিশুশ্রম জরিপ করা হচ্ছে বিষয়টি আঁচ করতে পারলে শিশুরা পালিয়ে যায় অথবা কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শিশুদের তাড়িয়ে দেয় বা লুকিয়ে রাখে।

| ক্রমিক নং | সেক্টরের নাম | কারখানার সংখ্যা | শিশু শ্রমিকের সংখ্যা (জন) |
|---|---|---|---|
| ১ | এ্যালুমিনিয়াম | ৮১ | ১৩৯ |
| ২ | তামাক/বিড়ি | ১৪৫ | ৪৪৫ |
| ৩ | সাবান | ০১ | ০১ |
| ৪ | প্লাষ্টিক | ১২ | ৪৬ |
| ৫ | কাঁচ | ০০ | ০০ |
| ৬ | ষ্টোনক্রাসিং | ২৯ | ৪৯ |
| ৭ | স্পিনিং | ৩৩ | ১৬৫ |
| ৮ | সিল্ক | ০১ | ০১ |
| ৯ | ট্যানারি | ০০ | ০০ |
| ১০ | শীপব্রেকিং | ২০ | ২০ |
| ১১ | তাঁত | ১৯ | ৩৭ |
| | মোট = ৩৪১ | | ৯০৩জন। |

২৩ জেলার উপমহাপরিদর্শকগণ নির্ধারিত সেক্টরে কর্মরত শিশুদের মা-বাবা/অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিক/ব্যবস্থাপনার সাথে নিয়মিত মত বিনিময় ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা করে যাচ্ছে। মে মাস পর্যন্ত এ ধরণের কার্যক্রম চলবে; এরপরও শিশুশ্রম থেকে সংশ্লিষ্ট কারখানা বিরত না থাকলে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হবে।

এ পর্যন্ত সারাদেশে শিশুশ্রম নিয়োজিত করায় ১৩৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ মামলাগুলো মালিকের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। শ্রম আইনে শিশুশ্রমের জন্য মা-বাবা বা অভিভাবকের বিরুদ্ধেও মামলা দায়েরের বিধান আছে।
উপমহাপরিদর্শক, বরিশালের আওতায় ৬টি জেলা-বরিশাল, ঝালকাটি, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালি ও বরগুনা রয়েছে। এই ছয়টি জেলায় তামাক/বিড়ি, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, বেকারি ও বিস্কুট ফ্যাক্টরি, স-মিল, ব্রিকফিল্ড, হোটেল ও রেস্তোরা, দোকান/শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মোটর গাড়ির হেলপার, টেম্পু, নৌকা চালানো, মাছ ধরা, ইত্যাদি সেক্টরে শিশুশ্রম আছে। ডাইফ কর্তৃক এ বছরে নির্ধারিত সেক্টরসমূহের মধ্যে বিড়ি সেক্টর রয়েছে এবং এখানে কারিকর নামে একটি বিড়ি ফ্যাক্টরিতে মোটামুটি ৭০০ জন শিশু শ্রমের সাথে জড়িতে রয়েছে। এ পর্যন্ত শিশু শ্রমের জন্য এখানে ৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
তবে মামলা করে শিশুশ্রম নিরসন করা যাবে না। এক কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করলে শিশু আরেক কারখানায় কাজ করতে যাবে। সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আর অভাবি পরিবারে সংস্থান করতে হবে অর্থের।

শিশুশ্রম নিরসনের জন্য সমাজের সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট শিশুর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে ডাইফ তো আছেই।

**শিশুশ্রম নিরসন নিয়ে একটা থ্ লাইনার:**

শিশু আর যাবে না কাজে, থাকবে পড়ায়
সকল শিশুর এ অধিকার আছে ধরায়
ডাইফ রয়েছে পাশে বাংলাদেশ গড়ায়।

# নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন

শিবনাথ রায়
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
শ্রম অধিদপ্তর

শ্রমিক কল্যাণ ও সুস্থ শ্রম পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ভূয়সী প্রশংসিত। সুস্থ শ্রম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, মালিক-শ্রমিক সমন্বয় এবং শ্রম অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন হয়ে আসছে যা শ্রম কল্যাণে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে । দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণেই মূল তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। "সুস্থ শ্রমিক নিরাপদ জীবন, নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন" প্রতিপাদ্যের এ বিষয়টির মধ্যে শ্রমিকের কর্মময় জীবনে নিরাপত্তার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কর্মপরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই দিবসটির লক্ষ্য।

স্বাধীনতার পরপরই তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ,স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রম কল্যাণে সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন এবং বাংলার শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেন। শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা প্রদানে জাতির পিতার দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখেই দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের বৈধ এবং আইনগত অধিকার। শ্রমিকদেরকে একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ প্রদান করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পরিবেশের অনুশীলন উন্নত করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো হলঃ পরিচ্ছনতা, বায়ু চলাচল এবং তাপমাত্রা ব্যবস্থা, কৃত্রিম আর্দ্রকরণ, জনবহুলতা, আলোর ব্যবস্থা, অগ্নি সংক্রান্ত ঘটনা, অতিরিক্ত ওজন, বিল্ডিং এবং যন্ত্রপাতির সুরক্ষা, যন্ত্রপাতিকে ঘেরাও করা, চলমান যন্ত্রপাতির উপর বা কাছাকাছি কাজ করা, বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস ও ধুলা, বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা আছে যা কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারের বিধান উল্লেখ করে। শ্রমিকের চোখের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত চশমা বা চোখের আবরনের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে উৎক্ষিপ্ত বা বিচ্ছুরিত কণা বা টুকরা থেকে অথবা অতিমাত্রায় আলো বা উত্তাপের কারণে চোখের ক্ষতির আশংকা থাকে। যেখানে শারীরিক আঘাত, বিষক্রিয়া বা গুরুতর রোগের সম্ভাবনা আছে এমন কোন ক্ষতিকর অপারেশনের ক্ষেত্রে, কর্মরত প্রতিটি শ্রমিকের জন্য সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা অথবা কাজটি যেখানে হচ্ছে তার কাছাকাছি জায়গায়, এবং অপারেশনে ব্যবহৃত সরঞ্জামের ব্যবহার অথবা অপারেশনের সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়া এবং নোটিশের মাধ্যমে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারবিধি ও সতর্কতা সম্পর্কে জানানো এইসব বিষয় নিয়োগকর্তার দায়িত্ব। ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য সরঞ্জাম দেওয়া সত্ত্বেও, এটি ব্যবহার না করা হলে তার দায়িত্ব শ্রমিকের নিজের ।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব থেকে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে হবে। ২০১৩ সালে সংশোধিত শ্রম আইনে বলা হয়েছে কোন কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক থাকলে সেখানে একজন ডাক্তার থাকবেন, একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক থাকলে একটা ক্লিনিক থাকবে, ২০ জনের বেশি নারী শ্রমিক থাকলে পরিচর্যার জায়গা থাকবে। দেশের সব শিল্পের জন্যই পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিজেরা সচেতন হলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' শুধুমাত্র শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ বিষয়ের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তি।

সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করেছে যা ২০০৯, ২০১০ এবং সর্বশেষ ২০১৩ সালে তিনটি ধাপে সংশোধন করা হয়েছে। দেশে ০৩টি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত সকল শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক কল্যাণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ, দেশে প্রথমবারের মত স্বল্প ব্যয়ে শিল্প শ্রমিকদের পেশাগত দূর্ঘটনা ও রোগ ব্যাধির আধুনিক চিকিৎসা এবং পূণর্বাসনের লক্ষ্যে টঙ্গী, গাজীপুর ও চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ এ দুইটি Occupational Diseases Hospital নির্মাণ সবকিছুই টেকসই শ্রম পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মস্থলে উন্নত কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন এখন অন্যতম মাইলফলক।
বাংলাদেশ সম্প্রতি এলডিসি (LDC) ভুক্ত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্মক্ষম শ্রমিক, নিরাপদ কর্মস্থল ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বহিঃর্বিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হবে - এই হোক আমাদের প্রত্যয়।

# The Role of Occupational therapy in Industrial Settings

**Dr. Md. Anwar Ullah, FCMA**
Additional Inspector General (Joint Secretary)
Department of Inspection for Factories and Establishments

## 1, Introduction

The practice of occupational therapy (OT) is concerned with enabling people to perform the occupations in which they participate throughout their daily lives such as personal care (getting dressed, cleaning teeth, shopping); productivity (paid or unpaid work, housework or school); leisure (sport, games, hobbies, social life); and in overcoming barriers. Occupational therapy practice aims to:

* Promote occupational health and well being;
* Prevent decline of abilities in the performance of occupations;
* Maintain or improve abilities in the performance of occupations; and
* Compensate for decreased ability in the performance of occupations.

Occupational therapists are trained to evaluate the individual's motor, physical, psychological, and cognitive body functions and to compare the individual's functional abilities to those required by the job. In addition, occupational therapists have the observational skills, training, and expertise to perform complex task analysis and assessment of the environmental factors affecting work performance. In the area of industrial rehabilitation, occupational therapy practitioners perform physical capacity evaluations for workers' compensation cases, develop accurate job descriptions, perform objective job analysis, provide work conditioning and on-site therapy services, and identify reasonable accommodations to achieve a successful job match. Industrial rehabilitation often focuses on musculoskeletal disorders (MSDs) such as repetitive strain injury.

**The major goals of work rehabilitation are:**

* To develop physical tolerance for work (including flexibility, strength, and endurance);
* To develop safe job performance;
* To prevent re-injury, to develop and reinforce appropriate work behaviors; and
* To determine if tool or job site modifications, ergonomics, or assistive technology will remove barriers to return to work.

Occupational therapists use work-related activities in the assessment, treatment, and management of individuals whose ability to function in a work environment has been impaired by physical, emotional, or developmental illness or injury. Work rehabilitation provides a transition between acute care and return to work while addressing the issues:

* Of safety;
* Physical tolerances;
* Work behaviors;and
* Functional abilities.

## 2. The Role of Occupational Therapy

Below are some of the ways in which occupational therapy practitioners play a vital role in addressing the deficits often experienced by individuals with cognitive impairment.

* Analyze the client's role in the workplace and provide recommendations to the employer and individual on ways to be successful. This intervention can begin in an outpatient setting to generalize and practice the tasks needed to successfully complete work responsibilities before actually returning to the workplace.
* Create a memory book or set up external aids (e.g, a smart phone reminder) to help the person perform a specific task, assist with organizing the daily work flow, and offer cues for timelines and deadlines.
* Train the individual with auditory processing impairments in compensatory strategies such as asking the supervisor to provide written information or e-mail requests versus just verbal instructions.
* Assist with vision rehabilitation and train the client on ways to best maneuver in the environment with visual impairments.
* Set up goals and work on cognitive rehabilitation to improve insight, attention span, carryover, problem solving, and sequencing while also decreasing external stimuli
* Address relaxation and stress management to help the individual achieve restorative sleep, to better function at work.
* Address clients' mental health to help them function successfully. This is a vital step in ultimately resuming a productive life, as these individuals want and need to work to maintain self-esteem and the ability to support themselves and their families.
* Evaluate the ability to resume driving, which can be an important factor in determining an individual's ability to return to work safely. Some facilities have driving programs that include specialized evaluation and on-the-road testing, but even generalist occupational therapists can assess performance skills that may have an impact on the future ability to drive safely or use alternate community mobility options.

## 3. Functional Capacity Evaluation

A functional capacity evaluation (FCE) evaluates an individual's capacity to perform work activities related to his or her participation in employment (Sore et al., 2008). The FCE process compares the individual's health status, and body functions and structures to the demands of the job and the work environment. The ability to analyze an activity in detail to determine the necessary components to perform the task competently is a unique core skill of occupational therapists, based on their education and training. FCEs typically require the evaluator to determine the worker's capability to perform various work-related tasks and

whether there is a match between these abilities and the essential job performance components. Although individuals from other disciplines can be involved in FCEs, the occupational therapy practitioner brings unique knowledge and skills related to the complex and dynamic interactions between the person, the environment, and the occupation.

**The FCE may be used to determine:**

* Ability to safely return to work status (including full duty, modified duty, or transitional duty).
* Work ability status for vocational rehabilitation.
* Workers' compensation case settlement.
* Disability status.
* Ability to meet job demands as part of a hiring process (pre-work/post-offer employment testing).
* Ability to meet the demands of other activities (i.e., being a student, volunteering).

**4. Occupational Therapy in Ergonomics**

The use of ergonomics principles can increase worker productivity and quality. Employers can implement a program that includes guidelines for employees to follow, contributes to an efficient work environment, prevents injuries and the development of chronic medical conditions, and helps employees return to work after an injury has occurred. Occupational therapy practitioners are trained in the structure and function of the human body and the effects of illness and injury. They also can determine how the components of the workplace can facilitate a healthy and efficient environment or one that could cause injury or illness. An occupational therapist can help employers identify hazards that may contribute to on-the-job injury, and determine how it can be eliminated.

**What can an Occupational Therapist do?**

* Identify and eliminate accident and injury risk factors in the workplace, such as actions associated with repetition, force, fixed or awkward postures, poorly designed tool handles, heavy loads, distance, vibration, noise, extreme temperatures, poor lighting, and psychosocial and other occupational stresses.
* Analyze job functions and job descriptions based on job tasks.
* Design pre-hire screenings to determine a candidate's suitability to a particular Modify tools and equipment so that they do not enable injury or job.
* Provide education and training on injury prevention, workplace health and safety regulations, and managing job-related stress.
* Determine reasonable accommodations and worksite accessibility
* Recommend changes employers can take to minimize injury and accident risk factors.

## 5. OT Services in Ergonomics

Occupational therapy goal to promote the health and safety of the workforce of all ages by minimizing employee exposures to musculoskeletal disorder through the analysis of

*Repetitions
* Forceful exertion
* Awkward postures
* Contact stress
* Vibration
* Extreme temperatures
* Risk of injury associated with cognitive process changes (e.g. manufacturing process changes such as computerization, increased automation, decreasing mental alertness)
* Technology
* Aging
* Risk of injury associated with sensory and physiological changes
* Lighting

Occupational therapist performing ergonomic interventions utilize a variety of measuring devices, equipment, symptoms surveys, and nationally standardized tools to measure and analyze potential risks to the work force. The data acquired can then be applied directly and indirectly in the following manners:

(a) Administrative Controls: The way in which work is assigned or scheduled that reduce the magnitude, frequency or duration of exposure to musculoskeletal disorder risk factors. Such as

* Job rotations
* Task enlargement
* Education and training programs such as educate proper manual lifting Technique, educate joint protection, Educate energy conservation techniques.
* Job demand analysis
* Safety teams management

(b) Engineering Controls: Physical changes to a job that reduces musculoskeletal disorder hazards and includes:

**(i)Work stations re-design according to worker work demand**

* Considering the work surface height by elbow height
* Adjust the work surface height based on the task being performed
* Provide a comfortable and adjustable chair for seated operation
* Provide anti fatigue mats for a standing operation Locate all tools and materials within normal working area to minimize motion
* Minimize reflection, sound, vibration, and extreme temperature

**(ii) Modifications for Injury Prevention:**

This can include the design and set-up of tools, equipment, and even the behaviors and motions of employees. For example, instead of lifting heavy items that can cause lower back pain, they can be slid on surfaces of equal height. Also, custom desk and keyboard setups for each worker can reduce injury.

(c) Work Practice Control: The way in which an employee performs physical work activities of a job that reduce or control exposure to musculoskeletal disorder hazards

* Neutral posture during work such as maintain body positioning, use of arm rest, wrist rest, foot rest, back rest, zone of reach and positioning of equipment,
* Micro breaks between work
* Use personal protective equipment such as hearing protective devices, such as ear muffs and ear plugs, respiratory protective equipment, eye and face protection, such as safety glasses and face shields, safety helmets, fall arrest harnesses for working at heights, skin protection, such as gloves, gauntlets and sunscreen, clothing, such as high visibility vests, life jackets and coveralls, footwear, such as safety boots and rubber boots.
* Desk and key board height should be adjustable to prevent Musculoskeletal disorder.
* If working with vibration tools and equipment: How to reduce vibration directed into the hands, how to grip tools properly for safe operation, the need to keep tools well maintained.

**6. Educate Proper Lifting Technique**

Maintaining proper lifting techniques prevent musculoskeletal injury. Follow these tips to avoid compressing the spinal discs or straining your lower back when you are lifting:

* Keep a wide base of support. Your feet should be shoulder-width apart, with one foot slightly ahead of the other (karate stance).
* Squat down, bending at the hips and knees only. If needed, put one knee to the floor and your other knee in front of you, bent at a right angle (half kneeling).
* Keep good posture. Look straight ahead, and keep your back straight, your chest out, and your shoulders back. This helps keep your upper back straight while having a slight arch in your lower back.
* Slowly lift by straightening your hips and knees (not your back). Keep your back straight, and don't twist as you lift.
* Hold the load as close to your body as possible, at the level of your belly button.
* Use your feet to change direction, taking small steps.
* Lead with your hips as you change direction. Keep your shoulders in line with your hips as you move.
* Set down your load carefully, squatting with the knees and hips only.
* Avoid jerky movements lift smoothly

### 7. Educate Energy Conservation Techniques

Energy conservation refers to the way activities are done to minimize muscle fatigue, joint stress, and pain. By using your body efficiently and doing things in a sequential way, you can save your energy. Work Simplification and Energy Conservation principles will allow you to remain independent and be less frustrated by your illness when the energy you have lasts throughout the day. Energy Conservation Principles and Techniques are:

**Balance Rest and Activity**

* Frequent short rests are of more benefit than fewer longer ones.
* The amount of rest you need and the amount of activity you can do will vary day to day.
* Plan your work so difficult tasks are done during your best time of day and are distributed throughout the week.
* Avoid activities which cannot be stopped immediately if they become too stressful.
* Rest before you tire.
* Plan a balance of work, recreation, exercise, and rest.
* If possible, lie down to rest.
* Practice breathing techniques.

**Joint Protection Techniques**

* Respect pain
* Balance rest and activity
* Rest painful and swollen joint
* Maintain proper posture and body position
* Avoid positions of deformity
* Avoid gripping things too tightly
* Use the longest and largest joints
* Avoid holding your joint in one position for too long
* Change activity from one group of joints to another regularly
* Conserve energy Wear splints as prescribed
* Regular gentle exercise

### 8. Conclusion

Employers may think that implementing ergonomic changes will be a huge cost. This could be true in the short-term, but long-term costs can drastically be reduced. Instead of thinking of workplace ergonomics as an expense, view it as an investment. Workplace ergonomics can decrease costs of workers' compensation, employee turnover, and absenteeism, return to work and also help better retain employees. If companies invest for employees' wellness, comfort, and productivity, it's likely that they will be benefited in terms of sustainability and profitability in the long run.

# শিল্প কারখানায় নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ তৈরীর প্রত্যাশায় অগ্নিকাণ্ড রোধে সেইফটি কমিটির কাংক্ষিত ভূমিকা

**ব্রিঃ জেঃ (অবঃ) আবু নাঈম মোঃ শাহিদউল্লাহ**
সদস্য-জাতীয় স্বাস্থ্য, শিল্প ও নিরাপত্তা কাউন্সিল
এবং
প্রাক্তন মহা-পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

তাজরিন ফ্যাশন গার্মেন্টস এ ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনার পর রানা প্লাজার মারাত্নক দুর্ঘটনা ঘটার প্রেক্ষিতে সারাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পোষাক শিল্পের নিরাপত্তা বেশ জোরদার করা হয়। অতঃপর গাজীপুরে ট্রাম্পাকো শিল্প কারখানায় ২০১৬ সালে ঘটে যাওয়া অগ্নি দুর্ঘটনায় ৩১ জনেরও অধিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়ে প্রমাণ করে যে দেশের অন্যান্য শিল্প খাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরীতে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। অপরদিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের পাশাপাশি সেইফটি কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের পাশাপাশি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিরাপত্তামুলক দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৩২৩ অনুযায়ী গঠিত জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনার অলোকে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা -২০১৫ এর তফসিল-৪ এ সকল সেইফটি কমিটির যথাযথ ভূমিকা পালন ও নীতিমালা বাস্তবায়নে মালিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্য শ্রমিক সংগঠন থেকে, এক তৃতীয়াংশ শিল্প মালিক সংগঠন থেকে এবং এক তৃতীয়াংশ সংখ্যক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ কিছু সংখ্যক বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এর সমন্বয়ে এই "জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল" গঠন করা হয়েছে। অপরদিকে পঞ্চাশ শতাংশ শ্রমিক ও পঞ্চাশ শতাংশ মালিক পক্ষের প্রতিনিধির সমন্বয়ে প্রতিটি কলকারখানা ও স্থাপনায় সেইফটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিদর্শক বৃদ্ধিসহ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিদর্শক সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারের এ সকল ব্যবস্থার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, এনজিও সমূহ কলকারখানার নিরাপত্তার বিষয়ে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে শ্রম আইনের বিধিমালার তফসিল-৪ এ সেইফটি কমিটির সদস্যদের জন্য কিভাবে প্রশিক্ষনের আয়োজন করতে হবে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শ্রমিকদের মধ্য থেকে কমপক্ষে ছয় শতাংশ শ্রমিককে অগ্নি-নির্বাপন প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষিত করার বিধান রয়েছে। উপরন্তু কি ধরনের এবং কি পরিমানের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি কারখানায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং এতদসঙ্গে অবকাঠামোগত নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত করতে হবে তার দিক-নির্দেশনা বিধি-বিধানে উল্লেখ রয়েছে।

এতদসত্বেও শিল্প প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনাসহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। তাহলে আমাদের দুর্বলতা কোথায়, কিভাবেই বা অগ্নিকান্ডের মত ভয়াবহ দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে এবং এ অবস্থার উত্তরনে আমাদের সম্ভাব্য কি পদক্ষেপ নেওয়া সমীচীন হবে তা খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবস্থা না নিতে পারলে আবারও কোন বড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া শিল্প কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এখন পর্যন্ত অনেক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়নি। আর যারা করেছেন তাদের অনেকেই এর সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেননি। ফলশ্রুতিতে বাস্তবজ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাবে সেইফটি কমিটিসমূহ অকার্যকর

রয়েছে। অপরদিকে ভুক্তভোগী শ্রমিক-মালিকদের অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে অত্যাধুনিক শপিংমল "বসুন্ধরা" এ ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা প্রমাণ করে যে কোটি কোটি টাকার উন্নত সরঞ্জামাদি ও আয়োজন অগ্নি নির্বাপনে কখনই যথেষ্ট হতে পারেনা যদিনা তা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

শিল্প কারখানায় অগ্নিকান্ড মোকাবেলায় আয়োজিত মহড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও দেখা যায় যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা বাস্তবমুখী হচ্ছে না। মহড়া আয়োজনের খবর আগে থেকেই সবাইকে অবহিত করা হয়, ফলে মহড়ায় আকস্মিকতা না থাকায় সবাই গতানুগতিক কাজ করে থাকেন,ফলে মহড়া ফলপ্রসু হয় না। উন্নত দেশের মত মহড়ায় প্রকৃত অগ্নিকান্ডের পরিবেশ তৈরী করা না গেলে বাস্তবে যখন অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে তখন শ্রমিক-মালিক বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়েন এবং তড়িৎ গতিতে সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন। তাই সেইফটি কমিটির উদ্যোগে সুপরিকল্পিত ও বাস্তবমূখী মহড়ার আয়োজন করতে হবে যাতে মহড়ার মূল উদ্দ্যেশ্য ব্যহত না হয়।

অগ্নি প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেইফটি কমিটির উদ্যোগে নিজ নিজ কারখানা ও স্থাপনার পাশাপাশি নিকটবর্তী ১০/১২টি শিল্প কারখানার সঙ্গে নিরাপত্তার কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে জোটবদ্ধ হতে সক্ষম হলে সম্মিলিতভাবে অগ্নিকান্ড প্রতিরোধ সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

সমঝোতায় প্রথমত, জোটবদ্ধ কারখানার মালিকগণ খরচ ভাগাভাগি করে কারখানা এলাকার মাঝামাঝি স্থানে একটি ফায়ার ফাইটিং গাড়ী ক্রয়ের মাধ্যমে একটি মিনি ফায়ার ষ্টেশন স্থাপন করতে পারেন যাতে যে কোন একটি কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ী আসার পূর্বেই অগ্নি নির্বাপনে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়। ফলে প্রাণ রক্ষার পাশাপাশি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিতভাবে অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। আর এই ফায়ার ফাইটিং গাড়ী একটি আধুনিক জীপ গাড়ী থেকে ও কম খরচে ক্রয় করা যায়। উল্লেখ্য, এ ধরনের উদ্যোগের সূচনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ইতোমধ্যে গ্রহণ করছে।

সমঝোতার দ্বিতীয় বিষয় হল এই মিনি ফায়ার ষ্টেশন সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য সর্বোচ্চ ১৮/২০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী দরকার হবে। এই সংখ্যক কর্মী জোটবদ্ধ কারখানা থেকে পালাক্রমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মীর মধ্য থেকে যোগান দেওয়া কোন দুরূহ ব্যাপার নয়।

সমঝোতার তৃতীয় নিরাপত্তার বিষয় হল পানির উৎস সার্বক্ষণিক সংরক্ষণ করা। অগ্নি দুর্ঘটনা মোকাবেলায় যথেষ্ট পানির প্রয়োজন হয়। আর বর্তমান নগরায়নের প্রেক্ষাপটে পানির উৎস ক্রমশই কমে যাচ্ছে। তাই জোটবদ্ধ কারখানা এলাকায় কোন পুকুর বিদ্যমান থাকলে তা প্রয়োজনে সংস্কার করে পর্যাপ্ত পরিমান পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর তা না থাকলে সম্ভব হলে পুকুর খনন করতে হবে কিংবা খরচ ভাগাভাগি করে ডিপ টিউব-অয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করে পাইপ সংযোজনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি কারখানায় হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে যাতে বিপদে পানির স্বল্পতা প্রাণহানির কারণ হয়ে না দাড়ায়।

সমঝোতার চতুর্থ বিষয় হল জোটবদ্ধ কারখানাসমূহ কর্তৃক যৌথভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও মহড়ার আয়োজন করা। এহেন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা গেলে দেখা যাবে যে একটি কারখানায় অগ্নিকান্ড ঘটলে বর্তমানের তুলনায় দশগুন ফায়ার কর্মী একত্রে অগ্নি নির্বাপনের কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে এবং ফায়ার সার্ভিস আসার পূর্বেই আগুন নিভিয়ে ফেলার সক্ষমতা অর্জিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, যেসব কারনে বড় ধরনের অগ্নিকান্ড সংঘঠিত হয় যেমন বৈদ্যুতিক গোলযোগ, গ্যাস সঞ্চালনে লিকেজ থাকা, বয়লার বিষ্ফোরণ, কেমিক্যাল দ্রবাদি সংরক্ষনে অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দিতে হবে। তারপরেও অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে তাই অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে প্রত্যেক কারখানা ও স্থাপনায় 'ফায়ার প্লান' এবং 'ইভেকুয়েশন বা অপসারন পরিকল্পনা' তৈরী করে সকলকে অবহিত করতে হবে। একইভাবে জোটবদ্ধ কারখানা এলাকার জন্য এই দুই ধরনের পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন হবে যাতে সু-পরিকল্পিতভাবে দুর্ঘটনা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়।

তাই আজ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮ কে উপলক্ষ্য করে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সমীচীন হবে এই বলে যে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরির প্রত্যাশায় আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিটি কলকারখানা ও স্থাপনায় অন্যান্য নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি একটি চৌকশ সেইফটি কমিটি সংগঠিত করি যাতে অগ্নিকান্ডসহ কোন দুর্ঘটনায় আর একটিও প্রাণ হারাতে না হয় এবং জাতীয় সম্পদও অযথা বিনষ্ট না হয়।

# Fire Accident Related Disability: The Experiences of Tazreen Garment Women Workers

**Dr. Mohammad Mahbub Alam Talukder**
Professor, Accident Research Institute (ARI))
Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)
Dhaka- 1000

## Introduction

It is found that every fire incidence cause loss to huge financial assets and economy. The garment owners stop and close the garments after causing fire. The fire burns to ashes the standing property and readymade garments products in the store or in go dawn. The physical assets like building and other garment machineries and equipment accessories are burnt into ashes. By analyzing the trauma incidences and the way of being gone under any sort of treatment, the scenario of health-seeking behavior and depriving experiences of the victims might also be understood from the case studies that have been mentioned in brief below:

## First aid tools and service is essential for emergency service:

First Aid is an important tool for any organization. In Tazreen, a several number of employees got minor injuries which they had to go to hospital but in the garment industry they did not receive first aid services. one victims said;"When the fire started to spread over the ground floor, I came down from the 2nd floor first time escaping me and I was wounded with the gate in my leg and it was bleeding. I was so scared and felt pain but nobody helped me to take medicine. Everyone was looking towards fire and up stair. I was later admitted into local clinic and they gave me first aid"(R-09).

## Loss of independency

"I am 28 years old women living with my family members but I have less independency because I am now not earning. I have to depend on their will and wish. I cannot go outside. I need someone's help to go outside because my leg was burned. It is one kind of imprisonment. I have no choice no wish; I lost my freedom. I feel very desolate and distress regarding my future! Sometimes I became overwhelm when I find me as distressed upon my will and independence" (R-2).

## Disability and economic consequences

"Everybody look me with pitiful eyes but I do not wish to look at me in that expression. I lost my leg due to burning. I cannot walk independently. I need other's help. I have to stay at house and nobody offered me job as I am a one legged women. I cannot work so my earning is stopped. I became burden and I am highly economically vulnerable. My future is dark" (R- 29).

### Cost of treatment and coping mechanism

"120 days was a critical days of my life and I had to stay at the General hospital named Dhaka Pediatric hospital. "The service was really good but I had to pay 3lakh taka what I got from BGMEA and caritas, even I had to pay all of my savings, I have no saving, no income to meet up the expenditure of food and other cost. I cannot stay in Dhaka because I am now jobless. How can I cope with the hardship of daily life?"(R-15).

### Financial burden on the family

"It is important for a person to become self dependent. I can realize now in every point of my daily life. When I worked in the factory and earned money my family members tried to make me happy by their attitudes and service delivery but now I become useless to them as I am dependent on them"(R-1)

### Sexual weakness and negligence

"I was looking smart and lovely girl when I was young. My husband left me after fire accident. I lost my beauty and glamour after burning my face and body. I could not make my husband happy and I become burden upon him. After few months he left me and finally he married another girl". She added that "I am alone and I am helpless physically and sexually. People neglect me both physically and mentally"(R-22).

### Living with limited desires

"As I am unemployed at this moment I cannot buy what I desire. I am living with limited desire, certain boundary and shrink me out of delight and happiness. I am really distress in term of express my real desire and want actually what I wanted to avail. Physically, sexually, mentally and financially, in all respect I have to stop my pleasure said a victim girl"(R-31).

### Bitter experiences with the family members

"Living with the family members after falling in fire accident it was bitter experience said a victim girl. Relatives of the family feel boring and burden for the victim she added. When I seek assistance initially they showed me sympathy but after few months they showed negligence and do not take care of me. Even they express negatively. They feel extra burden and not happy to see me. For asking any support they make bitter comment about me"(R-23).

### Change relationship

After accident a girl revealed the tragic story."My husband left me because I could not meet his sexual demand, I am now not a beautiful lady as my mouth has burnt and it looks ugly. The newly married wife of my husband looks beautiful and she can please him. On the other hand I am a burden for my husband so he left me after 4 months while I returned from hospital. The relationship is now cut off. Please let me a life where I can get calm and quiet "(R-26).

**Physical and psychological vulnerability:**

The study shows that almost 2/3 of the employees who were working in the Garment at the evening shift injured partially and severely. Many of them were wounded due to hurry and rush movement of crowded employees without any direction at the emergency exit. Garment authority did not play effective role to control the scared and trembled victims. There were major mistakes and lack of supervision during fire in the garment floor said the respondents. The physically injured victims become permanently disabled which made them vulnerable. "I will not die by fire flames in the burning room; rather I should die outside of the room by jumping"

**Financial vulnerability and dependency:**

The poor people from Rangpur came to Dhaka in search of jobs to fulfill basic needs i.e. food, health service and shelter. They reared the dream in their mind and joined the Tazreen Garment as workers. Their dreams will never come to true because many of them burnt into death. They went away where there is no end. They will not bring back said an old lady named Shobera Begum, the grandmother of a dead employee of Tazreen. She showed a photo of her grandson and said that why she was still alive why not she shall die. It was informed that 36 of the spot dead employees of Tazreen were belong to Rangpur who dead earlier.

**Psycho-social disabilities and mental sickness:**

"When I came to know that I am in the Hospital" said Nasima Akhter Banu, Card No.-2228, Operator-25,. It was Saturday at 8 am, we started work in the factory and continued till afternoon, but at 3.30pm it was declared by Tazreen office that we had to work another 3 hours. At 6.15pm, we heard fire alarm and everybody run to and fro. I also followed my other colleagues. We did not find any gate to open for escaping but all gates were shut down. The last attempt was jumping into window like other colleagues to escape me from the burning flames. I could not remember what it was next. I, myself got up at the Pediatric Hospital of Dhaka city. I felt pain in my left leg and right hand, both limbs were broken. Two months I had to spent in Hospital for treatment and about three lakh taka was expensed. 1 lakh taka was assisted by BGMEA and the rest was borne by my own source and borrow from relatives. Now, I can not do regular activities and felt in uncertainty"

**Recommendations**

- The following attempts could be taken to prevent and protect the unwanted fire related accident in the garments industries.
- The garment's building should not be established in a narrow road or space where fire brigade cannot enter into;
- Garments should not be established in multi stored buildings, there should be law against this practices;
- There should have wide space for movement of the fire brigade so that when any disaster

occurs they can move quickly and take rapid action there to;

- Exit doors should be increased in numbers so that the workers can use when any danger or emergency arises;
- Within the vicinity of the factory or garment yards, there should be kept enough sand bags and bucket with full of water;
- The fire alarming system should be demonstrated in every quarter or certain periods when the prevalence of fire occur specially in the month of February to June;
- The owners and employees should have strong bondage and implementation of labor law at the garments so that the employees can enjoy their rights;
- Ensure effective monitoring and observation so that any necessary action may be taken there of;
- Implement ILO rules and law for the RMG for the welfare of all staff of the industry, including workers;
- To make rehabilitation plan for the victims by owners and government;
- To follow rule of infrastructure which actually the precondition of buyers. This should be maintained ; and
- Fire fighting related equipments and other necessary equipments must be kept as emergency items.

# পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব

**কামরান টি. রহমান**
সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করতে মানুষের শ্রম প্রয়োজন। একক যন্ত্র দিয়ে উৎপাদন সম্ভব নয়। মানুষের মেধা দিয়ে যন্ত্র আবিষ্কার হয় এবং সে যন্ত্র দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। কারণ মেধা ও শ্রমে শিল্প সৃষ্টি হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ বিভিন্ন প্রকার হুমকির সম্মুখীন হয়ে থাকে। রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপাদন করতে মানুষ যে সব হুমকির সম্মুখীন হয়ে থাকে, সে সব হুমকির চিত্র আমাদের অনেকটাই অজানা থেকে যায়। ফলে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দূর্ঘটনার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে প্রতিনিয়ত সাংঘাতিক রকমের দূর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এ উপমহাদেশে ভারতের ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় মর্মান্তিক বিস্ফোরণ বিশ্বকে হতভম্ভ করেছিল। বাংলাদেশে তাজরিন ফ্যাশন ও রানা প্লাজার দূর্ঘটনা জাতিকে স্তম্ভিত করেছিল। প্রতিনিয়ত শিল্প-কারখানা ও কর্মক্ষেত্রে আগুন, দূর্ঘটনা, বিস্ফোরণ, আকস্মিক দৈব এবং নানাবিদ বিপযয় ও বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরূপ ঘটনা কেবল শ্রমিকের জীবনে মৃত্যু, ক্ষত, জখম ইত্যাদি বয়ে আনছে না, এতে প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে ; পরিশেষে এ ক্ষতি রাষ্ট্রকে বহন করতে হচ্ছে।

রাসায়নিক শিল্প-কারখানাগুলো বিস্ফোরণের শুধু হুমকি নয়, এসব কারখানা হতে বিষাক্ত ধোঁয়া, গ্যাস, বাষ্প রাসায়নিক দ্রব, আবর্জনা ইত্যাদি নির্গমন ও নিঃসৃত হয়ে পরিবেশ দুষনীয় করে তুলছে। মানুষ ও অন্যান্য সকল জীবের জীবন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

দূর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করেছে। এ আইনগুলো শিল্প-কারখানায় বা কর্মক্ষেত্রে সঠিক ও যথাযথভাবে প্রতিপালন করলে অনেক দূর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব। এসব আইনের বিধান কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা দেখার জন্য সরকার পরিদর্শন দপ্তরকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে অধিদপ্তর করেছে এবং প্রশিক্ষিত পরিদর্শক নিয়োগ করছে। পোষাক শিল্পে বড় বড় দূর্ঘটনার জন্য বিদেশী ক্রেতাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। আমেরিকা ও ইউরোপের ক্রেতাদের সংগঠন এ্যালাইন্স ও এ্যাকোর্ড সরকারের সহযোগিতা নিয়ে পোষাক কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য চার বছর ধরে কাজ করে পোষাক কারখানার নিরাপত্তা পরিবেশের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের কর্মজীবন নিরাপদ নিশ্চিত করা এবং কারখানার ইমারতের চারিত্রিক অখন্ডতা ও অভেদ্যতার প্রভূত উন্নয়ন করা। সরকার এখন Transition Monitoring Committee গঠন করছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রেতাদের সংগঠনদ্বয় হতে নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রতিকার বা প্রতিবিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করা। আশা করি এ কমিটি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং দূর্ঘটনা প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কেবল ইমারতের চারিত্রিক অখন্ডতা ও অভেদ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, তেমনি বহুপ্রকার রাসায়নিক পদার্থও উদ্ভাবন হয়েছে। আর এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে মানুষের জীবন যেমন সহজ ও আরামদায়ক হয়েছে, তেমনি হয়েছে মানুষের জীবন বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ।

রাসায়নিক পদার্থ ও এর প্রক্রিয়া কি ধরনের বিপজ্জনক অবস্থা মানুষের জীবনে সৃষ্টি করে থাকে সে সম্পর্কে এ পেশায় যারা নিয়োজিত তাদের রাসায়নিক কারখানা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন একান্ত প্রয়োজন। রাসায়নিক বিষক্রিয়ার কারণে জীবদেহে নির্দিষ্ট ক্ষতি সাধন করে থাকে। প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থই মানবদেহের জন্য প্রচ্ছন্ন হুমকি। এ প্রচ্ছন্ন

হুমকির পরিমান নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমাপ সম্ভব। পদার্থের প্রকৃতি রাসায়নিক ক্রিয়াক্ষমতার উপর নির্ভর করে প্রচ্ছন্ন হুমকির পরিমান। বিষক্রিয়ার পরিমাণ নিরুপণ করতে হলে পদার্থ কতটুকু মানবদেহে প্রবেশ করছে এবং কত সময় ধরে শ্রমিক বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে উন্মুক্ত বা অবস্থান করছে নির্ধারণ প্রয়োজন। এভাবে হুমকির পরিমান নিরুপণ করতে হয়।

কর্মক্ষেত্রে বিষাক্ত পদার্থ বা জীবাণু খাদ্যনালীর মাধ্যমে প্রবেশ করে থাকে। সুতরাং খাদ্যনালীকে হেফাজত করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য বা জীবাণু কর্মপরিবেশে চর্মের মাধ্যমে জীবদেহে প্রবেশ করে থাকে। সুতরাং চর্মের যত্ন প্রয়োজন। তেমনিভাবে চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিল্প কারখানার কর্মপরিবেশ শোভন ও শালীন নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক ও মালিকের সব দায়িত্ব। শোভন কর্মপরিবেশে শ্রমজীবী মানুষ যেমন নিরাপদ থাকে, তেমনি উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্রবাহমান ধারা অব্যাহত থাকে এবং উৎপাদনশীলতা নিরবিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং উৎপাদনের সাথে জড়িত সকল পক্ষ অর্থাৎ মালিক, শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা পক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে আইনের বিধান জানতে হবে ও প্রতিপালন করতে হবে। আইন মানতে হবে এবং অপরকে শিক্ষা দিতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির কল্যাণে ও জাতীয় স্বার্থে কর্ম পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হবে, সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সচেতন করতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

# কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন হতে হবে সবাইকে

**ড. প্রকৌশলী মাসুদা সিদ্দিক রোজী**
চেয়ারম্যান, রিহ্যাব ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মজীবীদের দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে কর্মক্ষেত্রে। কাজেই প্রতিষ্ঠান ছোট-বড় যাই হোক না কেন, কর্মীদের ইতিবাচক, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ দিতে হবে। কর্মীদের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ না হলে যথাযথ কাজের পরিবেশ তৈরি হয় না কর্মক্ষেত্রে।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশ্বের যে সব দেশ পিছিয়ে আছে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ঝুঁকিমুক্ত নয়। জাতিসংঘ, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের সার্বিক পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ করার বিষয়ে ব্যাপক জোর দিয়েছে। বাংলাদেশও ইতোমধ্যে ঐ মিছিলে শরিক হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ কর্মীদের জন্য আলাদা টয়লেট, সাবান, বিশ্রাম নেওয়ার কক্ষ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। সব প্রাপ্য সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মীদের অধিকার সচেতনতাও প্রয়োজন। এসব নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক মানসিকতা যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন কর্মীদের সহযোগিতা। প্রতিষ্ঠানের কাজ সঠিকভাবে সহজে করার জন্য নিয়মগুলোও সহজ হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বেতন বেশি, ঝকঝকে চকচকে পরিবেশ ও নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা ফিকে হয়ে যাবে যদি কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তা না দেওয়া হয়। এ ছাড়া কর্মচারীদের সঙ্গে যেকোনো

দুর্ঘটনার সময় কী করণীয়, সেসব বিষয়েও আমাদের আলোচনা করতে হবে এবং অনুশীলন করতে হবে।
শ্রম আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করা। তাই আইনের আলোকে বলা যায় কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের বৈধ এবং আইনগত অধিকার। শ্রম আইন ২০০৬ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত পেশাগত স্বাস্থসেবা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো হলোঃ ১) পরিচ্ছন্নতা ২) পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল এবং তাপমাত্রার ব্যবস্থা ৩) আলোর ব্যবস্থা ৪) অগ্নি সংক্রান্ত ঘটনা ৫) কৃত্রিম আর্দ্রকরণ ৬) জনবহুলতা ৭) অতিরিক্ত ওজন ৮) বিল্ডিং ও যন্ত্রপাতির সুরক্ষা ৯) যন্ত্রপাতিকে ঘেরাও করণ ১০) বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস, বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিষয়ে সতর্কতা ১১) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার ১২) ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা।
মালিক, শ্রমিক এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর একযোগে তৎপর হলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন কিছু নয়। শুধু একটু সদিচ্ছা থাকলেই আমরা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করে সারা বিশ্বে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবো।
"সুস্থ শ্রমিক, নিরাপদ জীবন- নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দেশব্যাপী জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮ পালন করতে যাচ্ছে এজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।
বর্তমান সরকার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যমাত্রায় টেকসই শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাস এবং টেকসই উৎপাদনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমার জানা মতে, বাংলাদেশে ৮৩ লক্ষ ইকোনমিক ইউনিট রয়েছে। সবক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করতে গণসচেতনতা প্রয়োজন। এ দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও মালিক সবার মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

# পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

**ডাঃ শফিউর রহমান**
সহকারী অধ্যাপক , পেশা ও পরিবেশ স্বাস্থ্য বিভাগ, নিপসম, ঢাকা

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বলতে আমরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা কর্মীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বুঝি। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা কতটুকু সেটিই বুঝায়। কর্মের পরিবেশটা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেটিও আমাদের বিবেচনার বিষয়। এই পরিবেশের সাথে যারা জড়িত যেমন- সহকর্মীবৃন্দ, পরিবারবর্গ এমনকি যারা ক্রেতা এবং ঐ পরিবেশে বিচরণ করে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষণকেও বুঝায়।

সাধারণত যারা কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন তাদেরই এই দিকটা দেখাশুনা করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্যের সকল দিক এবং নিরাপত্তার সকল দিক নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতাকে বুঝায়। শুধুমাত্র অসুখের অনুপস্থিতিকেই স্বাস্থ্য বুঝায় না। একজন ব্যক্তির পেশাগত দায়িত্ব পালনে যাতে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় কিংবা ন্যূনতম ক্ষতি হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। কর্মক্ষেত্রে কোন কর্মী যাতে আকস্মিক দুর্ঘটনা কবলিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।

সাধারনত ৩টি লক্ষ্যে কাজ করতে হয় কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশের উন্নয়ন ও কাজের এমন ব্যবস্থাপনা যাতে কাজের সময় পরিবেশটা সুস্বাস্থ্যের দিকে থাকে। মানসিক অবস্থা, রোগের পরিসংখ্যান, ফিজিওথেরাপি, পুনর্বাসন, পেশার আংশিক পরিবর্তন, কর্মক্ষেত্রের আয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে। পূর্ববর্তী কোন কার্যক্রম যদি কোন সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে তবে তা পরিহার করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে দেহের অবস্থান সঠিক হতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর বিরতিতে যেতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কর্মীর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক অবস্থানের সর্বোচ্চ পরিচর্যা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। খনির পরিবেশ তুলনামূলকভাবে খারাপ এবং ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও কাজ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে থাকে তবুও সে কাজ করতে গিয়ে মানুষ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে যায়। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছে কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল এজেন্ট, পরিবেশগত অবস্থা, এলারজেন, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা। যে সকল মেশিনারিতে শব্দ বেশী সেগুলিতে কাজ করলে মানুষ শ্রবণ শক্তি হারায়। কর্মক্ষেত্রে পড়ে গিয়েও মানুষ ব্যথা পায়। এমনকি মারাও যেতে পারে যেমন- নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে কিংবা মালামাল স্থানান্তর করতে গিয়ে। মেশিনের চলমান অংশ থাকতে পারে, ধারালো অংশ থাকতে পারে এবং গরম অংশ থাকতে পারে। এগুলিতে কর্মীরা আঘাত পেতে পারে, কেটে যেতে পারে কিংবা পুড়ে যেতে পারে। বায়োলজিক্যাল স্বাস্থ্য সমস্যা বলতে আমরা বুঝি সংক্রামক জীবাণু দ্বারা অথবা তাদের বিষদ্বারা আক্রান্ত হওয়া যেমন- এনথ্রাক্স। কর্মীরা ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। পশু কামড়াতে পারে কিংবা পোকা মাকড় হুল ফুটাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কেমিক্যালের সংস্পর্শে আসলে ক্যানসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কর্মক্ষেত্রে বেশী সময় থাকলে বা চাকরিতে অনিশ্চয়তা থাকলে মানসিক ও সামাজিকভাবে কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা প্রকারভেদে ভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন- যারা নির্মাণ কাজ করে তারা পড়ে গিয়ে ব্যথা পেতে পারে। এমনকি মারাও যেতে পারে। আবার যারা নদীতে কিংবা সাগরে মাছ ধরে তারা ডুবে মরতে পারে। যে সকল পেশা বিপদ সংকুল তন্মধ্যে মাছ ধরা, আকাশে বিচরণ করা, করাত দিয়ে কাঠ চিরা, ধাতু নিয়ে কাজ করা, ক্ষেতে খামারে কাজ করা, খনিতে কাজ করা এবং যানবাহন চলাচলে কাজ করা ইত্যাদি।

**নির্মাণ :**

নির্মাণ হলো একটি অতি সাংঘাতিক পেশা। কারণ ইহাতে বহুলোক আহত হয় এবং মারা যায়। নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে পড়ে যাওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। এই সকল বিপদ থেকে রেহাই পেতে গেলে শরীরে বর্মের আচ্ছাদন ব্যবহার করতে হবে, সঠিকভাবে লোহার কিংবা কাঠের বেড়া ব্যবহার করতে হবে, ভাল মই ব্যবহার করতে হবে এবং পরিদর্শনের জন্যে ভালভাবে মঞ্চ তৈরী করতে হবে। তবেই দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে। নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাস বেশী। তারা বাষ্প, গ্যাস, ধূলা ও ধোঁয়ার সম্মুখীন হয় বেশী।

**কৃষি :**

যারা কৃষি কাজে নিয়োজিত তাদের অনেকেই ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়। যারা ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ করে তাদের শ্রবণ শক্তি নষ্ট হতে পারে, চর্ম রোগ হতে পারে এবং কেমিক্যালের জন্য কিংবা অতিরিক্ত রোদের কারণে শরীরে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। কৃষি কাজে যারা বিষ ব্যবহার করে তাদের অসুখ দেখা দিতে পারে। এমনকি জন্মগত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। অনেক সময় পরিবারের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও কৃষি কাজে সহায়তা দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তাদেরও অসুখ বিসুখ হতে পারে।

**চাকরি:**

চাকরিজীবীগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বসে কাজ কর্ম করেন। ফলে তাদের স্থুলতা দেখা দেয়, অনেকেই পেশাগত মানসিক চাপের মধ্যে থাকে। আবার অনেকের নির্দিষ্ট সময়ের বেশী কাজ করতে হয়, অনেকেই আবার চাকরিতে অনিশ্চয়তায় ভোগেন। খনি, তেল ও গ্যাস উত্তোলন: যারা খনিতে কাজ করেন কিংবা তেল ও গ্যাস উত্তোলনে কাজ করেন তাদের অনেক সময় ক্ষতিকর কেমিক্যালের সম্মুখীন হতে হয়। এদের অনেকেই অতিরিক্ত সময় কাজ করে থাকেন। এই কেমিক্যালগুলো যখন চর্মে লাগে তখন চর্ম রোগের সৃষ্টি হয়। এদের বেশীর ভাগই বাষ্প, গ্যাস, ধূলা ও ধোঁয়ার সম্মুখীন হয়।

**স্বাস্থ্য সেবা এবং সামাজিক সহযোগিতা :**

পেশাগত দায়িত্ব পালনে অসুস্থতায় যে সকল রোগী ভর্তি হয় তাদের মধ্যে আঘাতই বেশী। বেশীর ভাগ রোগী পা ফসকে বা পড়ে গিয়ে ব্যথা পায়। আবার অনেকেই সন্ত্রাসের শিকার হয়েও ব্যথা পায়। পেশাগত কাজে নানাভাবে মানুষ আক্রান্ত হয় বা মারা যায়। যেমন -

- পাইলট অনেক সময় দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে মারা যায়।
- যারা বর্জ্য সংগ্রহ করে কিংবা পরিষ্কার করে তারা অনেক সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।
- যারা গো-মহিষাদি চড়িয়ে থাকে।
- যারা ইলেক্ট্রিসিটি নিয়ে কাজ করে।
- যারা ছাদের কাজ করে।
- যারা ট্রাক বা ভারি যান চালায়।
- যারা পাহাড়ের খাদে কাজ করে।
- যারা অগ্নিনির্বাপনে কাজ করে থাকে।

এদের সকলেরই মাংসপেশীতে কিংবা হাড়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আঘাতপ্রাপ্তদের বেশীর ভাগই পুরুষ।

পেশাগত এই বিষয় গুলো বিবেচনায় রেখে সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশের পাবলিক হেলথ এর সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ "জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)" স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঐতিহ্যগতভাবে নিপসম দেশের ও দেশের বাইরের পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল এর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে "পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য" বিষয়ে গুণগত পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর । প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে ২০ জন এমবিবিএস ডাক্তার পেশাগত বিষয়ে উচ্চতর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যৌক্তিক অবদান রাখছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রশিক্ষণ, সেমিনার সিম্পোজিয়ামে এই বিষয়ের শিক্ষক/ ছাত্রগণ অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনতামুলক কাজে উদ্বুদ্ধ করছে।

২০১৫/২০১৬ অর্থ বছরে নিপসম এর পক্ষ থেকে সরকারি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তারদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আপডেট ধারনা সম্বলিত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে ।

এছাড়া ও ২০১৫/২০১৬ অর্থ বছরে নিপসম এর পক্ষ থেকে ১৯ টা ব্যাচে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, পাট, স্টিল মিল,আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, সিমেন্ট, সাবান, ঔষধসহ অন্যান্য কারখানায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা "পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য " বিষয়ে প্রায় ১০০০ জন শ্রমিককে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সরকারি/ বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় অনেক কাজ করেছে বাংলাদেশ। তবে আত্মতৃপ্তির কোনো সুযোগ নেই। এখনো অনেক কাজ বাকি। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে শিল্পের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিও টেকসই হবে না।

# Understanding of Occupational Safety and Health Management System to create Safety Culture at the Industry level in Bangladesh

**Dr, M.H. Faruquee, Associate Professor**
And
**A,K,M Masum Ul Alam, Adjunct Faculty**
Department of Occupational and
Environmental Health
Bangladesh University of Health Sciences
mahmudfaruquee@buhs.ac.bd

Safe and healthy work is a human right and takes an enormous toll. Also Safety and Health is a fundamental element for sustainable development. Every day, 6,400 people die from an occupational accident or disease, amounting to 2.3 million deaths each year. A further 860,000 people are injured on the job daily. The cost to businesses amounts to US$2.8 trillion annually – 4 per cent of global gross domestic product – through lost working time, interruptions in production, treatment of occupational injuries and diseases, rehabilitation and compensation.

However, most of these incidents are avoidable. It entails commitment from governments, employers and workers, but they all have every reason for giving high priority to occupational safety and health (OSH). It is our duty to reaffirm the right to a safe working environment for all.

In last near past Bangladesh showed tremendous development in Occupational Safety in Bangladesh. After Rana Plaza tragedy visible change has been occurred in Bangladesh in creating Safe workplaces. Safe workplace depends on Occupational Safety and Health (OSH) Management System. A good number of safety initiatives have been undertaken in Bangladesh without appropriate OSH Management System or National OSH program. The formulation of national OSH program is an effective way of consolidating national tripartite efforts to improve the OSH systems. National OSH program cover key aspects such as national policy; high-level commitment and vision that are publicly expressed and documented; national strategy including national OSH profile; targets, indicators, responsibilities and resources; and government leadership. However, some countries denote the National OSH Programme as "Strategy", "Strategic plan", or "Plan of action".Also the country OSH Management system comprised of OSH Policy, OSH Profile and National Plan of Action on OSH. In Bangladesh, OSH Profile has been prepared in 2002;OSH Policy has been formulated in 2013 and in process to prepare the National Plan of Action on OSH. These are the basic instruments for country OSH Management System.

According to OSH Policy, Bangladesh OSH profile should have to be updated in five years. OSH profile is a mirror of OSH situation of a country.A fundamental basis for national OSH program and system is the national OSH policy and the government's commitment for implementing it.

A national OSH policy is a specific, deliberate course of action adopted by a government (in consultation with the social partners) to fulfill its mandate for the prevention of occupational accidents and diseases. The national OSH policy defines the main goal of the country on OSH, its extent and its beneficiaries, indicating the direction of national efforts. It also defines the functions (regulation, inspection, promotion and support, training, etc.), and responsibilities that should be in place in order to reach this goal, as well as the principles that will be the framework for guiding the way things should be done.

Frequently there exists no single written document explicitly nominated as national policy on OSH; instead, statements are included in a number of different documents (National Labour Policy, National Health Policy, foreword of the main OSH Act, etc.). The development and implementation of national OSH policy is the responsibility of governments in tripartite collaboration with employers' and workers' organizations.

OSH Profile is a diagnostic document, which summarizes the existing OSH situation, including national data on occupational accidents and diseases, high-risk industries and occupations, and a description of the national OSH system and its current capacity. The National OSH Profile is a "picture" of the National OSH situation at one moment in time. After collection and analysis of the information, it provides the basis for a diagnosis of the strengths and weak points and for selecting priorities for intervention. The profile is one instrumental step in the development of a national OSH Programme, and also has the purpose of being a reference for assessing and comparing the progress, performance and impact of the National OSH Programme.

**A National OSH Profile should**

* Include basic data on all the parameters that may affect the sound management of OSH at both national and enterprise levels, including the available legislative framework; enforcement and implementation mechanisms and infrastructures; workforce distribution; human and financial resources devoted to OSH.
* Provide practical information to all persons concerned with information on ongoing activities at country level (e.g. activities related to implementation of international agreements, ongoing and planned technical assistance projects, etc.).
* Provide better understanding of the environments (resources, activities, limitations, etc.) and other stakeholders.
* Provide a means of improved co-ordination and convergence of points of view, and of facilitating communication between all parties interested in OSH, given that it provides a common view of the most important issues to be taken into consideration in the national

administration of OSH.

* Serve as a basis for initiating a process by which a country will be able to identify gaps and opportunities for improvement in the existing legal, institutional, administrative, and technical infrastructure in relation to the OSH system.

* Serve as a reference with which to monitor the progress or development that can be achieved. The Profile is a tool that allows identification of the baselines and indicators. Also, profile could also be a promotional document to inform the public on the national situation on OSH and raise awareness and support on national initiatives.

OSH national programme or Plan of Action includes priorities, objectives and targets for improving occupational safety and health within a predetermined timeframe, and indicators to assess progress. The National OSH Programme takes into account the analysis, conclusions and the results of the profile to determine priorities for action (particularly relevant areas) and the goals to be reached within an agreed timeframe. The associated activities and actions to achieve the goals should then be formulated, including the expected results, resources, responsibilities and timeframes. After the Programme has been approved, the effectiveness of its implementation should be monitored and evaluated.

Despite of Bangladesh National OSH Policy reiterated in the Implementation work plan that the main responsibility the implementation of this policy in collaboration with the stakeholders lies with the Ministry of Labour and Employment. By appointing an officer of Joint Secretary Rank by the above-mentioned Ministry as the focal point the activities (Policy Implication) will have to be taken forward in unison with stakeholders at public and private sectors.

This Action Plan will include specific programs and time specific activities that the Government will undertake to ensure the implementation of the Occupational Health and Safety Policy with specific terms.

A National Plan of Action on Occupational Health and Safety will be formulated based on consultation with all stakeholders (including development partners) putting together all programs to be undertaken by the government, the Owner's Organizations/Associations and Trade unions.

**A National OSH Programme (National Plan of Action in OHS) shall:**

(a) Promote the development of a national preventative safety and health culture;
(b) Contribute to the protection of workers by eliminating or minimizing, so far as is reasonably practicable, work-related hazards and risks, in accordance with national law and practice.
(c) Be formulated and reviewed on the basis of analysis of the national situation regarding OSH, including analysis of the National OSH System;
(d) Include objectives, targets and indicators of progress; and
(e) Be supported, where possible, by other complementary national programmes and plans which will assist in achieving progressively a safe and healthy working environment.

**Additionally, the national OSH Programme should:**

1. Be prepared at country level and involve all relevant ministries or agencies concerned with OSH;
2. Be based on the National OSH Profile and other analytical relevant documents, and address both identified priorities and gaps in the existing framework;
3. Make better use of the existing structures, procedures and resources in this field;
4. Enhance coordination between all parties by means of common goals and joint working programmes.

The following diagram presents the position of a National OSH Programme and its relationships with other elements:

A national OSH Program has anchored by planning, Implementation, Evaluation and Review. The national OSH system ensure sustainability of improvements and build and maintain a safety culture. To achieve vision 20/21 and SDG Bangladesh have to establish OSH management system for creating safer workplace for future million young people, who are entering the labor markets every year serving national economy. Continuous efforts require to keep the momentum for changing and OSH Management System would be a significant milestone in Bangladesh to build Safety culture and in achieving SDG.

# Safe and Healthy Youth is a Smart Investment for Industries

ILO, Dhaka

28th of April is the World Day for Safety and Health at Work which is marked to promote the prevention of occupational accidents and diseases globally. This year, the theme of the World Day is "OSH vulnerability of young workers".

The International Labour Organization (ILO) has a long-standing commitment to the promotion of decent work and safe and healthy working conditions for all workers. According to the latest estimates released by the ILO, 2.78 million workers die every year due to occupational accidents and work-related diseases. Some 86 per cent of these deaths are due to work-related diseases, while over 13 per cent result from occupational accidents.

It is important to note that young workers have significantly higher rates of occupational injuries than adult workers. Compared with adults, they are more likely to be engaged in informal employment where they are exposed to various work hazards and have limited social protection coverage. As young people are still developing, both physically and mentally, hazardous chemicals and other agents in the workplace can put their health at considerable risks.

Moreover, young workers who are engaged in temporary work tend to have limited access to training and skills development as their work is only short-term. As a result, they rarely have the time or opportunity to become familiar with the occupational hazards, risks and prevention before they have to change jobs.

According to Bangladesh Labour Force Survey 2015-16, of the country's 58 million workforce more than 41 million are between 15-29 years old. These young people are often unaware of their rights and OSH responsibilities and may be particularly reluctant to report occupational risks in their workplaces. They also lack the bargaining power that more experienced workers may have. This can lead them to accept dangerous work tasks, poor working conditions, or other situations associated with precarious employment. Such conditions of informality, instability and non-standard forms of work cut across all the economic sectors and increase the vulnerability of young workers.

A young worker with a long-term impairment can cease to be an active member of society and make little use of the education and training that they have received. Hence protecting the safety and health of young workers is critical for the social and economic welfare of any nation. In order to create an enabling environment for young workers, special attention should be given to hazardous sectors and industries and to vulnerable youth who work in these sectors. Governments, employers and workers need to actively participate in securing safe and healthy working conditions through a system of defined rights, responsibilities and

duties where the principle of prevention is given high priority.

In recent years, institutionalization of OSH in Bangladesh has progressed with the establishment of OSH units within the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) and employers organizations. DIFE is on the front line to ensure workplace safety as its inspectors inspect factories and establishments across the country every day. Trade unions and women union leaders have also been mobilized to help increase the participation of workers in Safety Committees and to enhance women workers' participation in OSH initiatives at factory level.

The ILO has contributed to the development of a National OSH profile for Bangladesh and is supporting the implementation of the country's National OSH Policy as well as the formulation of a National Plan of Action for OSH. This national action plan will include measures and strategies to address workplace accidents and occupational diseases and focus on the development of a preventative safety and health culture that includes information dissemination, consultation and OSH training for workers, employers and the government. The mindset must be created that safety is the responsibility of all and that safety is an investment not a burden.

Healthy workers are more active and productive, and nurturing a generation of productive workforce is critical for the growth and sustainability of the industries. As Bangladesh moves towards becoming a developing country, investing in the health and safety of young people should be at the centre of the country's development agenda.

# তৈরী পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম

**মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া**
উপমহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

তাজরীন ফ্যাশন কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনার পর কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানাগুলোতে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ১৬/০৩/২০১৩ তারিখ জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action on Fire Safety for the Ready-Made Garment Sector In Bangladesh-NTPA) স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৪/২০১৩ তারিখ রানা প্লাজা ধ্বসের পর কারখানা ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা বিষয়টিও (National Tripartite Plan of Action on Fire Safety for the Ready-Made Garment Sector In Bangladesh-NTPA) কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। NTPA এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি (National Tripartite Committee for National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready Made Garments Sector in Bangladesh-NTC) গঠন করা হয়। রানা প্লাজা ধ্বসেরপর বাংলাদেশের রপ্তানীমুখী পোশাক কারখানাসমূহের ভবনের স্থায়িত্ব, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিয়ে দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে শঙ্কা সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে কারখানাসমূহে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত Preliminary Assessment এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

আইএলও-এর আর্থিক সহযোগিতায় ২০১৩ হতে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ক্রেতা জোট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Accord ১৫০৫টি, উত্তর আমেরিকান ক্রেতা জোট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Alliance ৮৯০টি এবং বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগে (National Initiative) ১৫৪৯টি অর্থাৎ মোট ৩৭৮০টি তৈরী পোশাক কারখানার Preliminary Assessment সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে ১৬৪ টি কারখানার Preliminary Assessment, Accord এবং Alliance যৌথভাবে সম্পন্ন করে। Preliminary Assessment রিপোর্টের ভিত্তিতে কারখানাসমূহে সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য Corrective Action Plan (CAP) প্রনয়ণ করা হয়।জাতীয় উদ্যোগের আওতার ১৫৪৯ টি কারখানার কাঠামোগত ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে ভবনসমূহকে চারটি ক্যাটাগরিতে (লাল, অ্যাম্বার, হলুদ ও সবুজ) ভাগ করা হয়েছে। সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ (লাল চিহ্নিত) কারখানাসমূহের ঝুঁকি পুনরায় পরীক্ষণের জন্যকলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শককে আহবায়ক করে বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি রিভিউ প্যানেল গঠন করা হয়েছে। রিভিউ প্যানেল ৩৭৮০ টি কারখানার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৬৩টি লাল চিহ্নিত কারখানা পরিদর্শন করে ৩৯টি কারখানা বন্ধ এবং ৪৭ টি কারখানা আংশিক বন্ধ ঘোষণা করে। বাকি কারখানাগুলোকে উউঅ এর মাধ্যমে সংস্কারমূলক কাজসহ উৎপাদন চালু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া রিভিউ প্যানেল মোট ৮১ টি ভবন পরিদর্শন করে ১৯ টি ভবন বন্ধ এবং ২৩ টি ভবন আংশিক বন্ধ ঘোষণা করে। এখন পর্যন্ত Accord, Alliance ও National Initiative কর্তৃক যথাক্রমে ৭৪৫,৫৬৬ ও ১৫৪৯ টি Summary Report প্রকাশিত হয়, যা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।

২৩/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম NTC'র সভায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শককে আহবায়ক করে স্ট্রাকচারাল এবং ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক্যাল সম্পর্কিত দুটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক্যাল সম্পর্কিত টাস্কফোর্সটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফায়ার এবং ইলেকট্রিক্যাল দুটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। স্ট্রাকচারাল টাস্কফোর্স রাজউক-এর একজন প্রতিনিধি এবং বুয়েট-এর দুইজন অধ্যাপক নিয়ে গঠিত। ফায়ার টাস্কফোর্স ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর একজন প্রতিনিধি এবং বুয়েট-এর একজন অধ্যাপক নিয়ে গঠিত।

টাস্কফোর্স তিনটি Corrective Action Plan (CAP) অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কারখানা ভবনের DEA (Detailed Engneering Assesment), ডিজাইন ও ড্রইং পর্যালোচনাপূর্বক সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করে।

**রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশনসেল (RCC) গঠন :**

Preliminary Assessment রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত Corrective Action Plan (CAP) অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানার সংস্কার কাজ সম্পাদন করবে। এই সংস্কার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০৯/১২/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত NTC'র১১তম সভায় Remediation Coordination Cell (RCC) গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪/০৫/২০১৭ তারিখ প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ১০ম তলা, ২০-২১ কাওরান বাজার এ RCC কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

১৪মে, ২০১৭তারিখে সংস্কার সমন্বয়সেল (RCC) উদ্বোধন করছেন শ্রমও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক, এমপি

**Core Body গঠন :**

Remediation Coordination Cell (RCC) এর নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব পালনের জন্য ২৬/০৬/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ঘঞঈ'র ১২তম সভায় ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সরকারের ৬টি নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিটি হতে ১ জন করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি Core Bod গঠিত হয়। উক্ত ৬টি সংস্থা হলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শক এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। জবসবফরধঃরড়হ Coordination Cell (RCC) এর মাঠ পর্যায়ের কাজ তথা ভবনসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক মনিটরিংয়ের জন্য প্রত্যেক দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা একাজে ন্যস্ত করবে যারা RCC'র কার্যক্রম চলাকালে পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করবেন। Core কমিটির নিয়মিত সভার মাধ্যমে Remediation কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

**Core Body নিম্নোক্তভাবে গঠিত :**

১) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর : ০১ জন
২) নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ : ০১ জন
৩) পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর : ০১ জন
৪) সচিব, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শক : ০১ জন
৫) উপমহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর : ০১ জন

**জাতীয় উদ্যোগের আওতায় ১৫৪৯টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা :**

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় উদ্যোগের আওতায় মোট ১৫৪৯ টি কারখানার প্রিলিমিনারি অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমের মধ্যে কারখানার স্ট্র্যাকচারাল, ফায়ার এবং ইলেকট্রিক্যাল নিরাপত্তা বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান (CAP) প্রনয়ণ করা হয়েছে। উক্ত কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান (CAP) এর ভিত্তিতে জাতীয় উদ্যোগের আওতায় মোট ১৫৪৯ টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান আছে। কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের তদারকি এবং কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য সংস্কার কাজের অগ্রগতি, উদ্ভুত সমস্যাসমূহ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্য কারখানা মালিকদের সঙ্গে ৩২ টি মতবিনিময় সভা করেছে। প্রথম পর্যায়ে নিজস্ব ভবনে অবস্থিত ৩৪৩টি কারখানার সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মতবিনিময়করা হয়। পরবর্তীতে ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত ৪৬৬টি কারখানাসহ মোট ৮০৯টি কারখানার সাথে মতবিনিময় সম্পন্ন হয়। কারখানার মালিকগণের সম্মতিক্রমে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করে প্রত্যেক কারখানাকর্তৃপক্ষের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

**জাতীয় উদ্যোগের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে :**

* সকল কারখানার Preliminary Assessment রিপোর্ট অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান (CAP) কারখানা কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়েছে।
* সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।
* ১৬৩টি কারখানা কর্তৃপক্ষকে স্ট্রাকচারাল ডিইএ এবং ৮০৯ টি কারখানাকে ফায়ার ও ইলেকট্রিক্যাল ডিইএ (ডিজাইন) জমাদানের জন্য বলা হয়েছে।
* কারখানা ভবনের স্ট্রাকচারাল ডিইএ DEA সম্পন্ন করার জন্য ২৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
* ফায়ার এবং ইলেকট্রিক্যাল DEA সম্পন্ন করার জন্য ১৯টি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
* ৬৭টি স্ট্রাকচারাল ডিইএ, ১৭টি ফায়ার, ২৬টি ইলেকট্রিক্যাল ডিইএ (ডিজাইন) অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে।
* স্ট্রাকচারাল টাস্কফোর্সের ২২টি, ফায়ার টাস্কফোর্সের ৯টি এবং ইলেকট্রিক্যাল টাস্কফোর্সের ৩টি সভা সম্পন্ন হয়েছে।
* জমাকৃত ৬৭টি স্ট্রাকচারাল ডিইএ, ১৭টি ফায়ার ডিইএ (ডিজাইন), ২৬টি ইলেকট্রিক্যাল ডিইএ (ডিজাইন) এর মধ্যে টাস্কফোর্সের সভায় স্ট্রাকচারাল ডিইএ ৪০টি, ফায়ার ডিইএ (ডিজাইন) ৮টি এবং ইলেকট্রিক্যাল ডিইএ (ডিজাইন) ০১টি সংশোধনের জন্য বলা হয়েছে। ২টি স্ট্রাকচারাল ডিইএ বাস্তবায়নের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
* সংস্কার কার্যক্রম নিয়মিত ফলোআপ করার জন্য প্রধান কার্যালয়ে RCC'র অধীন ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকৌশল টিম গঠন করা হয়েছে। RCC'র ৮ সদস্যে টিম সহায়তার জন্য পোশাক শিল্প ঘন চার জেলায় অত্র দপ্তরের ১৮জন প্রকৌশলীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারখানা পর্যায়ে সংস্কার কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্য ৮০জন পরিদর্শককে কেস হ্যান্ডালার হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

* কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান (CAP) অনুযায়ী টিমসমূহ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
* নিজস্ব ভবনে অবস্থিত ৩৪৩টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি ৩৩%। ভাড়াকৃত/শেয়ার ৪৬৬টি কারখানার কার্যক্রমের অগ্রগতি ২২%।
* কারখানা ভিত্তিক ৮০৯টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের সর্বমোট অগ্রগতি ২৭%।

**জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯ টি কারখানার বর্তমান তথ্য:**

| জেলা | মোট কারখানা | বন্ধ | অন্যত্র স্থানান্তর | ইপিজেডের অন্তর্ভুক্ত | অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্সে যোগদান | সংস্কার কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৬৪৯ | ২৮০ | ২১ | ০ | ৫২ | ২৯৬ |
| নারায়ণগঞ্জ | ২৯৮ | ৯৩ | ১৮ | ২ | ১৩ | ১৭২ |
| গাজিপুর | ৩৭২ | ৯৯ | ২৫ | ০ | ৫৮ | ১৯০ |
| চট্টগ্রাম | ১৯৩ | ৫২ | ৪ | ৯ | ২ | ১২৬ |
| অন্যান্য জেলায় | ৩৭ | ৭ | ০ | ১ | ৪ | ২৫ |
| **মোট** | **১৫৪৯** | **৫৩১** | **৬৮** | **১২** | **১২৯** | **৮০৯** |

**জাতীয় উদ্যোগের ১৫৪৯টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা**

১৪ মে, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে রিমেডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল (RCC) উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে নিজস্ব ভবনে অবস্থিত ৪৪৫টি পোশাক কারখানা মালিকের সাথে ৬ টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভার আলোচনার ভিত্তিতে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য কারখানা মালিকদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেপ্টেম্বর হতে নিজস্ব ভবনে অবস্থিত ৩০০ টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের তদারকি শুরু হয় যা এখনো চলমান রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত ৪১০ টি অ্যাম্বার (Amber) ও হলুদ (Yellow) চিহ্নিত কারখানা মালিকদের সঙ্গে ৭টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এপ্রিল, ২০১৮ তে ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত ৪৪৫ টি অ্যাম্বার (Amber) ও হলুদ (Yellow) চিহ্নিত কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে কারখানা লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এছাড়া রিমেডিয়েশন কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকির জন্য স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক্যাল তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক্যালের যথাক্রমে ২২, ৯ ও ৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## উপসংহার

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩৭৮০ টি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার Preliminary Assessment সম্পন্ন করা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ সরকার এবং তার উন্নয়ন অংশীজনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এই পদক্ষেপটি যেমন দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে তেমনি তা বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে। জাতীয় উদ্যোগের আওতার কারখানাসমূহের সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য RCC সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী যে RCC নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানার সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে একটি মাইলফলক সৃষ্টি করবে। নির্ধারিত মেয়াদের পর RCC সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর প্রস্তাবিত সংশোধিত অর্গানোগ্রামে এরূপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Industrial Safety Unit গঠন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

# কর্মজীবী অন্তঃসত্ত্বা নারীর চাকুরি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা

**মোঃ মতিউর রহমান**
উপমহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বিশ্বজুড়ে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। দৈনন্দিন গৃহের কাজের পাশাপাশি নারী কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করছে। নারীর এ কর্মক্ষেত্রে যোগদান কখনও দারিদ্র থেকে বাঁচার জন্য, কখনও তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্য। এটা আশাব্যঞ্জক যে নারীর জন্য অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।কিন্তু একজন কর্মজীবী নারীর এক মুঠো ভাতের যোগাড় কিংবা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের চেষ্টা হুমকির মধ্যে পড়ে যখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা হোন কিংবা মা হোন। গর্ভধারণের মত শারীরিক ও মানসিক দূর্বল অবস্থায় একজন কর্মজীবী নারীর প্রতি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন বিদ্যমান থাকলেও দেশে দেশে অনেক ক্ষেত্রে নারীর প্রসূতি/ মাতৃত্ব অধিকার উপেক্ষা করা হয়।

আইএলও (২০০৯) এর এক গবেষণা জরিপে দেখা যায় যে ৭৬% ম্যানেজার কোন চাকুরি প্রার্থী নারীকে নিয়োগ দেন না যদি জানতে পারেন যে সেই নারীটি চাকুরি শুরুর ছয় মাসের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হবেন। অস্ট্রেলিয়ান মানবাধিকার কমিশনের (২০১৪) আরেক গবেষণায় সেদেশের আরো ভয়ানক চিত্র উঠে এসেছে। প্রতি দুই জনে একজন কর্মজীবী মা মাতৃত্বজনিত কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

অন্তঃসত্ত্বা কিংবা কর্মজীবী মা-র প্রতি নিয়োগকারীর এ বৈষম্যমূলক আচরণ কেন? Better Work Indonesia এর মতে, বৈষম্যমূলক এ মনোভাবের পেছনে বহুবিধ কারণের অন্যতম হচ্ছে নিয়োগকারীর ধারণা- 'যখন একজন নারী অন্তঃসত্ত্বা হোন, তখন তার শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়'। আরো একটি কারণ হচ্ছে নিয়োগকারীর কর্তৃত্ববাদী সেই দৃষ্টিভঙ্গি যা মনে করে 'একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী কাজ করতে পারে না কিংবা তার কাজ করা উচিত না'। Halpert, Wilson & Hickman (১৯৯৩) ব্যাখ্যা করেন নিয়োগকারীদের একটা প্রচলিত নেতিবাচক ধারণা হচ্ছে যে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা শ্রমিক তার কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল থাকেন না এবং সন্তান জন্মদানের পর হয়ত আর চাকরিতে ফিরে আসবেনা। এই শেষোক্ত ধারনাটি ( চাকরিতে ফিরে না আসা) কতটুকু সত্য ?

L. Morris (২০০৮) তার গবেষণায় দেখেছেন যে অত্যন্ত শক্তিশালী আইন ও অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সুবিধা ও সহযোগিতা প্রদান সত্ত্বেও প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন কর্মজীবী নারীর মাতৃত্ব ছুটি কাটিয়ে চাকরিতে ফিরে যাওয়া ছিল 'অত্যন্ত কঠিন'। কেন? Morris তার গবেষণায় যে কারণগুলো পেয়েছেন সেগুলো হলো- শিশু যত্ন, সাংসারিক দায়িত্ব, একজন মায়ের দায়িত্ব, শিশুর প্রতি উৎকণ্ঠা, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সহকর্মীর আচরণ।

মাতৃত্ব একজন নারীর স্বাভাবিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়া। মাতৃত্ব প্রতিটি মায়ের অধিকার। তাছাড়া নারীরা হচ্ছেন জগতের ভিত। সন্তান জন্ম না দিলে বংশ থাকবে না, সমাজ থাকবে না, পৃথিবী থমকে যাবে। মানব জাতির অস্তিত্বের প্রয়োজনেই নারীর মাতৃত্ব। মাতৃত্ব ও জীবিকা দুটোই একজন কর্মজীবী নারীর জন্য গুরত্বপূর্ণ। কর্মজীবী মায়ের মাতৃত্বকে আলাদা করে দেখা যাবে না বরং তার কর্মজীবনের সাথে একসূত্রে গাঁথতে হবে। কর্মজীবী মায়ের জন্য মাতৃত্ব ও জীবিকা যেন পরস্পর কঠিন হয়ে না দাড়ায় ।

সুস্থ-সবল শিশু দেশের অমূল্য সম্পদ। মায়ের গর্ভকালীন সুস্থতাই পারে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে। তাই একজন

কর্মজীবী নারীর পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরী। মনে রাখতে হবে, গর্ভকালীন সময়ে নারীকে পেশাগত বিভিন্ন ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা করার মাধ্যমে অনাগত সন্তানকেও সুরক্ষা দেয়া হয়। অন্তঃসত্ত্বা মায়ের জন্য পেশাগত বিভিন্ন ঝুঁকির যে মাত্রা সহনীয়, মাতৃগর্ভে থাকা সন্তানের জন্য সে মাত্রা নিরাপদ নাও হতে পারে। তাই, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183)-এ শুরুতেই স্বাস্থ্য সুরক্ষা ( অনুচ্ছেদ ৩)-এ মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়েছে, "Each Member shall, after consulting the representative organizations of employers and workers, adopt appropriate measures to ensure that pregnant or breastfeeding women are not obliged to perform work which has been determined by the competent authority to be prejudicial to the health of the mother or the child, or where an assessment has established a significant risk to the mother's health or that of her child.

তাই কর্মজীবী অন্তঃসত্ত্বা নারী/ দুগ্ধদানকারী মা ও তার সন্তানকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্রের যেমন রয়েছে দায়িত্ব, তেমনি দায়িত্ব রয়েছে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের। রাষ্ট্রকে আইএলও-র Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) 3 Maternity Protection Recommendation, 2000 (No. 191) এ যেসব অধিকার/সুবিধার নিশ্চিতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা জাতীয় ভাবে আইনে সন্নিবেশ করার পাশাপাশি তা বাস্তবায়ণ ও তদারকির জন্য যথাযথ শক্তিশালী মনিটরিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। আইএলও-র উল্লেখিত কনভেনশন ও রিকমেন্ডশনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মাতৃত্ব ছুটি, অসুস্থতা কিংবা জটিলতার ক্ষেত্রে ছুটি (মাতৃত্ব ছুটির বাইরে), মাতৃত্ব সুবিধা, চাকুরি সুরক্ষা ও বৈষম্যহীনতার বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। সেগুলো অনুসরণে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ প্রসূতি নারীর অধিকার ও সুবিধা সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা নারীর জন্য মজুরীসহ ১৬ সপ্তাহ (সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৮ সপ্তাহ এবং সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরবর্তী ৮ সপ্তাহ) মাতৃত্ব ছুটি দেওয়ার নিয়ম আছে। সন্তান প্রসবের ১০-সপ্তাহ পূর্বে এবং ১০ সপ্তাহ পরবর্তি সময়ে কোন দুষ্কর বা শ্রমসাধ্য বা দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে কাজ করতে হয় এমন কাজে নারী শ্রমিককে নিয়োগ করা যাবে না। কোন মহিলা শ্রমিককে সন্তান প্রসবের পূর্বের ৬ মাস এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী ৮ সপ্তাহ মেয়াদের মধ্যে চাকরিচ্যুত করা যাবে না। বাংলাদেশ শ্রম- বিধিমালা -২০১৫-এ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অথবা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নারী শ্রমিককে নিয়োগ না দেয়ার বিধান রয়েছে। সন্তান প্রসব উত্তরকালে শিশুর দুগ্ধপানের সুযোগ ও পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। মালিক ও শ্রমিকগণ প্রসূতি মহিলার প্রতি এমন আচরণ বা মন্তব্য করবেন না যাতে তিনি শারীরিক বা মানসিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হোন বা অপমানিত বোধ করেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় সন্নিবেশিত এই সব বিধানসমূহে বর্ণিত এই সব অধিকার ও সুবিধা বাস্তবায়ণের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মোট নারী শ্রমশক্তি ১৯.১ মিলিয়ন যা দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৩১%। কাজে নিয়োজিত মোট নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৭.৮ মিলিয়ন (বিবিএস, ২০১৭)। এদের মধ্যে যারা অন্তঃসত্ত্বা বা মা হবেন, এদের প্রত্যেককে আইনের এই সব সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি আইনের যেসব বিধানের অভাবে কিংবা দূর্বলতায় অন্তঃসত্ত্বা বা দুগ্ধদানকারী শ্রমিক চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হোন বা বঞ্চিত হোন, আইনে সেসব বিষয় সংযোজিত করে তাদেরকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা যাক। বর্তমানে শ্রম আইন অনুযায়ী, সন্তান জন্মদানের পর অব্যবহিত ৮ সপ্তাহ একজন নারী শ্রমিক মজুরীসহ মাতৃত্ব ছুটি পান। এই ৮ সপ্তাহ পর সন্তান জন্মদানের কারণে মা যদি অসুস্থতা কিংবা জটিলতা অনুভব করেন, তাহলে মাতৃত্ব ছুটির সাথে অসুস্থতা ছুটি (মজুরীসহ সর্বোচ্চ ১৪ দিন) সমন্বয় করে ছুটি ভোগ করতে পারেন। এবার আসা যাক, বর্তমান প্রেক্ষাপটে। এটা অনুমাণ করা যায় যে আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীদের সিজারের মাধ্যমে বাচ্চার জন্ম হচ্ছে। আমাদের নারী শ্রমিকেরা সারাদিন (ওভারটাইমসহ) কর্মক্ষেত্রে কাজ করে রাতে বাসায় ফিরে সাংসারিক কাজ করেন। পরেরদিন সকাল ৮ টায় আবার কাজে যোগ দিতে তাকে ভোর বেলায় উঠতে হয়। এমনি যান্ত্রিক জীবনে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিকের শরীর থাকে অত্যন্ত দূর্বল।

সন্তান জন্মদানের মত কঠিন যন্ত্রণা সইবার মত যতটুকু শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা /শক্তি থাকা দরকার, তা হয়ত এই সব নারী শ্রমিকের থাকে না। তাই সন্তান জন্মদানের জন্য সিজার অপারেশনই হয়ত প্রথম অপশন। সিজার ওপারেশনের পর কতজন নারীর পক্ষে ৮ সপ্তাহ মাতৃত্ব ছুটি শেষে ফুলটাইম কাজে ফেরা সম্ভব? ৮ সপ্তাহের মধ্যে যদি তিনি কাজে ফেরার মত সুস্থ না হোন, উপায় কি? অসুস্থতা ছুটি সর্বোচ্চ ১৪ দিন ( যদি পূর্বে ১ দিনও ভোগ না করে থাকেন!) সমন্বয় করতে পারেন। কিন্তু এর পরেও অর্থাৎ ৮ সপ্তাহ প্লাস ১৪ দিন অর্থাৎ মোট ১০ সপ্তাহ পরেও যদি তিনি সুস্থ না হোন, কি উপায়? অর্জিত ছুটি থাকলে ভোগ করতে পারেন। না থাকলে তিনি বিনা বেতনে ছুটি নিতে পারেন। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর নিয়োগকারীর মর্জি। বিনাবেতনেও তিনি যখন ছুটি পান না, তার চাকুরিতে ছেদ তথা বিরতি হয়। তার চাকরির কন্টিনিউশন থাকে না। এই কারণে হয়ত তিনি আগের চাকুরিতে ফিরে যেতে পারেন না। তিনি পূর্বের কর্মস্থলে নতুন হিসেবে যোগ দিতে বাধ্য হোন অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন অথবা হয়ত চাকুরি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। এভাবেই দেশ নিরবে দক্ষ নারী শ্রমিক হারায়।

সন্তান জন্মদান, মায়ের সুস্থতা এবং বাচ্চার পরিচর্যার জন্য একজন মায়ের পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন। একজন শ্রমজীবী নারী সন্তান জন্মদান ও সন্তানের পরিচর্যার জন্য যাতে চাকুরি না হারান, তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে। একটি উন্নত রাষ্ট্র জার্মানীর উদাহরণ দেয়া যাক।

জার্মানে বাচ্চার জন্মের পূর্বে ৬ সপ্তাহ এবং জন্মের পরে ৮ সপ্তাহ মোট ১৪ সপ্তাহ পূর্ণ বেতনে বাধ্যতামূলক মাতৃত্ব ছুটি পাবেন একজন কর্মজীবী মা।তবে সিজার কিংবা মাল্টিপল বাচ্চা যেমন টুইন এর ক্ষেত্রে বাচ্চার জন্মের পর ১২ সপ্তাহ এ সুবিধা। সন্তান জন্মদানের পর এই ৮ কিংবা ১২ সপ্তাহ ছুটি ভোগের পরে কি হবে? একাধিক অপশন রয়েছে। সন্তান জন্মের পর মা-বাবা সর্বোচ্চ ৩৬ মাস অর্থাৎ তিন বছর Parental Leave নিতে পারেন। প্রতিটা বাচ্চার জন্য। এটা মা কিংবা বাবা এককভাবে অথবা দুইজনেই সমন্বয় করে ভোগ করতে পারেন। এটা বিনা বেতনে। তবে এই ৩ বছর ছুটি ভোগ অবস্থায় মা /বাবা আগের প্রতিষ্ঠানে Part time (30 hours per week) কাজ করতে পারবেন। এটা মালিকের মর্জি কিংবা অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে না। এটা Employee এর অধিকার। তবে, সেই প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১৫ জন কর্মচারী থাকতে হবে। ৩ বছরের এই লম্বা ছুটির (হোক না সে বিনা বেতনে) সুযোগটা কেন আইনে রাখা হয়েছে? একজন কর্মজীবী মা যেন সন্তান জন্মদানের পর আগের চাকুরিতে নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পারে, তার গ্যারান্টি দিচ্ছে আইন।

বাংলাদেশে সন্তান জন্মদানের পর মাতৃত্ব ছুটি ( ৮ সপ্তাহ) কাটিয়ে চাকুরিতে যোগদান করে একজন মা শ্রমিকের যদি অন্তত প্রথম ২ মাস কিংবা ৩ মাস ( জার্মানীতে ৩ বছর!) নমনীয় কাজের সময়ের (Flexible Working Time যেমন দৈনিক ৫ ঘন্টা) সুযোগ থাকে, তাহলে তিনি সুস্থ হওয়ার সুযোগ পান, শিশুর পরিচর্যার সুযোগ পান, জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু উপার্জন করতে পারেন এবং সর্বোপরি তার চাকরি বজায় থাকে।

জার্মানীতে প্রচলিত এই সব মাতৃত্ব সুযোগ-সুবিধার কথা Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183-এ উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ এই কনভেনশন এখনও অনুমোদন করেন নি। দেশিয় বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ও সামর্থ্যের আলোকে সরকার উপযুক্ত সময়ে জাতীয় আইনে এই সব সুযোগ-সুবিধা ও তার পরিমাণ সন্নিবেশ করবে। দক্ষ নারী শ্রমিককে শ্রম বাজারে ধরে রাখতে, নারীর ক্ষমতায়নে, কর্মক্ষেত্রে সমতার সুযোগ সৃষ্টির, আগামীর সুস্থ্য শিশুর জন্মের এবং দারিদ্র্য থেকে কর্মজীবী নারীকে বাঁচার সুযোগ দানের জন্য সরকার সময়ে সময়ে অধিকতর কল্যাণধর্মী মাতৃত্ব আইন প্রণয়ণ করবেন এবং নিয়োগকারী মালিকগণ তা মেনে সরকারকে সহায়তা করবেন- এটাই প্রত্যাশা।

# দুর্ঘটনা কি, কেন এবং এর প্রতিকার

**মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন**
উপমহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মুন্সিগঞ্জ

'একটি দুর্ঘটনা সারাজীবনের কান্না' প্রচলিত এই কথাটি যেন ক্রমাগত বাস্তব সত্য হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে আমাদের জীবনে। প্রতিনিয়ত সারা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিচ্ছে অগণিত মানুষ। সেই সাথে ধ্বংস হচ্ছে বিপুল সম্পদ ও পরিবেশের ভারসাম্য। এহেন বাস্তবতাকে সামনে রেখে দুর্ঘটনার বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

**দুর্ঘটনা :** প্রযুক্তিগত বিপদ, বিপদজ্জনক কর্মপ্রনালী, অবকাঠামোগত দুর্বলতা অথবা মানবসৃষ্ট কোন প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত এবং সম্ভাব্য ঘটনা যা সম্পদের ক্ষতিসাধন করে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যাহত করে অথবা পরিবেশগত অবনতি ঘটায় , এমনকি মৃত্যু ও জখমের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাকেই বলা হয় দুর্ঘটনা ।

**দুর্ঘটনার ধরণ : দুর্ঘটনা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন :**

- সড়ক দুর্ঘটনা ;
- শিল্পে দুর্ঘটনা ;
- প্রাকৃতিক কারণে দুর্ঘটনা ;
- পরিবেশগত কারণে দুর্ঘটনা ; এবং
- চিকিৎসায় অবহেলাজনিত দুর্ঘটনা

এখানে আমি আলোচনা করব শিল্পে দুর্ঘটনা সম্পর্কে। আসুন জেনে নিই শিল্পে দুর্ঘটনা কি, এর কারণ, ধরণ ও প্রতিকার :
**শিল্পে দুর্ঘটনা :** শিল্পে ব্যবহৃত কোন প্রযুক্তি, বিপদজ্জনক কর্মপ্রনালী, অবকাঠামোগত দুর্বলতা অথবা শিল্পে নিয়োজিত কর্মচারিদের অজ্ঞতা বা উদাসীনতা যা সম্পদের ক্ষতিসাধন করে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যহত করে অথবা পরিবেশগত অবনতি ঘটায়, এমনকি মৃত্যু ও জখমের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাকেই বলা হয় শিল্পে দুর্ঘটনা।

**দুর্ঘটনাসমূহ :** শিল্প কারখানায় সাধারণত নিম্নে বর্ণিত দুর্ঘটনাসমূহ পরিলক্ষিত হয় :-

- অগ্নিকান্ড ;
- রাসায়নিক /বয়লার/গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ;
- অমসৃণ বা অপরিচ্ছন্ন কর্ম পরিবেশের কারণে পিছলে পড়া/হোঁচট খাওয়া ;
- মেশিনের দ্বারা হাত-পা বা শরীরের কোন অংগ কেটে যাওয়া ;
- উপর থেকে পড়ে যাওয়া ;
- উপর থেকে কোন বস্তু শরীরের উপর পড়ে যাওয়া ;
- বৈদ্যুতিক শক পাওয়া ;
- পেশীতে টান লাগা ;
- বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে পড়া ;
- অনবরত বিকট শব্দের কারণে মানসিক চাপে পড়া এবং অনেকক্ষেত্রে শ্রবণশক্তি নষ্ট হওয়া ;

- সংঘর্ষে পতিত হওয়া ; এবং
- ত্বকে ক্ষত হওয়া।

**দুর্ঘটনার প্রভাব :**

**ব্যক্তি পর্যায় (নিয়োজিত ব্যক্তি)-**

- শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে যাওয়া ;
- কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া ;
- মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া ; এবং
- পারিবারিক জীবন বাধাগ্রস্ত হওয়া।

**ব্যক্তি পর্যায় (নিয়োগকারী)-**

- উৎপাদন ব্যাহত হওয়া ;
- উৎপাদনের মান ও পরিমাণ কমে যাওয়া ;
- প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হওয়া ;
- নিয়োজিত ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ ব্যয় ;
- দক্ষ শ্রমিক হারানো ; এবং
- সম্পদের ক্ষতিসাধন।

**জাতীয় পর্যায়ঃ**

- দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি পড়া ;
- বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়া ;
- দক্ষ শ্রমিকের অভাবে জাতীয় উৎপাদন ব্যাহত হওয়া ;
- শ্রমিকদের কলকারখানার কাজে আগ্রহ কমে যাওয়া ;
- রপ্তানী আয়ে বিরূপ প্রভাব পড়া ; এবং
- সর্বোপরি, জাতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়া।

**দুর্ঘটনার কারণ : শিল্পে দুর্ঘটনা ঘটার কারণসমূহ**

- দুর্ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান/ধারণার অভাব ;
- নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা ;
- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ;
- কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উদাসীনতা/অজ্ঞতা ;
- অসাবধানতা ;
- অন্যমনস্কতা ;
- সামর্থ্যের অতিরিক্ত ভারোত্তলন ;
- মানসিক অবসাদ ;
- পানিশূন্যতা/ অনাহার বা অর্ধাহার ;
- আলোর স্বল্পতা/ অপর্যাপ্ত আলো ;
- বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ;
- কর্মক্ষেত্রে বিশৃংখলা ;
- অমসৃণ / পিচ্ছিল কাজের জায়গা ;

- অতিরিক্ত কাজের চাপ ;
- পদ্ধতি না মেনে Shortcut উপায়ে কাজ করার প্রবণতা ;
- অতি উৎসাহী/ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ;
- নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ;
- যন্ত্রপাতিতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকা ;
- কর্ম পরিবেশে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখা ; এবং
- কর্মে নিয়োজিত করার পর সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা।

**দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়:**

আমরা জানি, পেশাগত দুর্ঘটনার ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার শ্রমিক আহত ও নিহত হচ্ছে যা শ্রমিকদের জীবনমান ও শিল্প উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব বয়ে নিয়ে আসছে। তবে সুখের বিষয় হলো বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই প্রতিরোধযোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য। আসুন জেনে নিই কিভাবে আমরা দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। বস্তুত, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুই না।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এমন একটি পদ্ধতি যা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পথ নির্দেশ করে ।

**ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে নিম্নোক্ত তিনটি ধাপে বাস্তবায়ন করা যায় :-**

- ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ;
- ঝুঁকি মূল্যায়ন ; এবং
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।
- ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ :-

**কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে:**

- এটি কোথায় ঘটছে (Place) ;
- এটির দ্বারা কে/কোথায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে (Exposure) ;
- কোন বিষয় এটিকে ঘটাচ্ছে (Unexpected Situations) ;
- এটির পরিণতি কি হতে পারে ; এবং
- অন্য কোন প্রভাবক কি এটিকে সাহায্য করছে?

দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে এমন বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি/বিপদ (Hazard) সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে, যেমন:

**রাসায়নিক ঝুঁকি:-** কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ হতে উদ্ভূত ঝুঁকি।
যেমন: কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ, ধূলাবালি, রাসায়নিক পদার্থ হতে উদ্ভূত গ্যাস, হাসপাতাল বর্জ্য, কীটনাশক, পরিস্কারক উপাদান, আবর্জনা, ধূলাবালি ইত্যাদি)।

**কর্মদক্ষতাজনিত ঝুঁকি:-** কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির শারীরিক গঠনে প্রভাব ফেলে এমন কর্মকান্ড।
যেমন: একই কাজের পুনরাবৃত্তি, হাতে কলমে রক্ষণাবেক্ষণ, বিকৃত শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে কাজ করা, ভারোত্তলন ইত্যাদি।

**শারীরিক ঝুঁকি:-** স্পর্শ না করলে ও যে উপাদানসমূহ/প্রভাবকসমূহ কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
যেমন: উচ্চ শব্দ, অসহনীয় আলো, উচ্চ তাপমাত্রা, বিকিরণ, বায়ু চলাচল ইত্যাদি।

**নিরাপত্তা ঝুঁকি:-** এমন কোন অনিয়ন্ত্রিত প্রভাবক অবস্থা অথবা কার্যক্রম যা থেকে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।
যেমন: পিছলে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া, উচুঁ স্থান হতে পড়া, হস্তচালিত যন্ত্র, প্লান/মেশিন এর কোন চলমান অংশ অথবা

তাদের ওজন, যানবাহন, বিদ্যুৎ, চাপ ইত্যাদি।

**শারীরিক বিপত্তিজনিত ঝুঁকি:-** এমন একটি জৈবিক উপাদান যা মানব স্বাস্থ্য এবং অন্য কোন জীবন কোষের উপর প্রভাব ফেলে।

যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, সংক্রামক বর্জ্য, সংক্রমণ ইত্যাদি।

**সংস্থাগত ঝুঁকি:-** কর্ম সংশ্লিষ্ট উত্তেজনাসমূহ যা কর্মে নিয়েজিত ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ায়।

যেমন: উত্তেজনা, অবসাদ ইত্যাদি।

শুধু ধারণা রাখলেই চলবে না, নিতে হবে সময়োপযোগী কতিপয় ব্যবস্থা। করতে হবে ঝুঁকি মূল্যায়ণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ । আসুন জেনে নিই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে কি পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

**তিনটি কার্যক্রমের মাধ্যম ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।**

- পরিকল্পনা গ্রহণ ;
- বাস্তবায়ন ; এবং
- পরিবীক্ষণ।

**পরিকল্পনা গ্রহণ:** ঝুঁকি সাধারণত কোন নির্দিষ্ট অথবা কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে কমানো যেতে পারে । ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো ঝুঁকির সম্ভাব্যতা এবং ঝুঁকির তীব্রতা কমানোর জন্য গ্রহণ করা হয়। এর সঙ্গে কিছু প্রযুক্তিগত নির্দেশনাও থাকে ।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পাঁচ ধাপের একটি ``Risk Control Hierarchy`` নির্ধারণ করা যায় যার প্রথম ধাপ অত্যন্ত কার্যকর। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কারখানা কর্তৃপক্ষের পিরামিডের প্রথম ধাপ থেকে কাজ শুরু করা উচিত। পিরামিডটি নিম্নে দেওয়া হলো ।

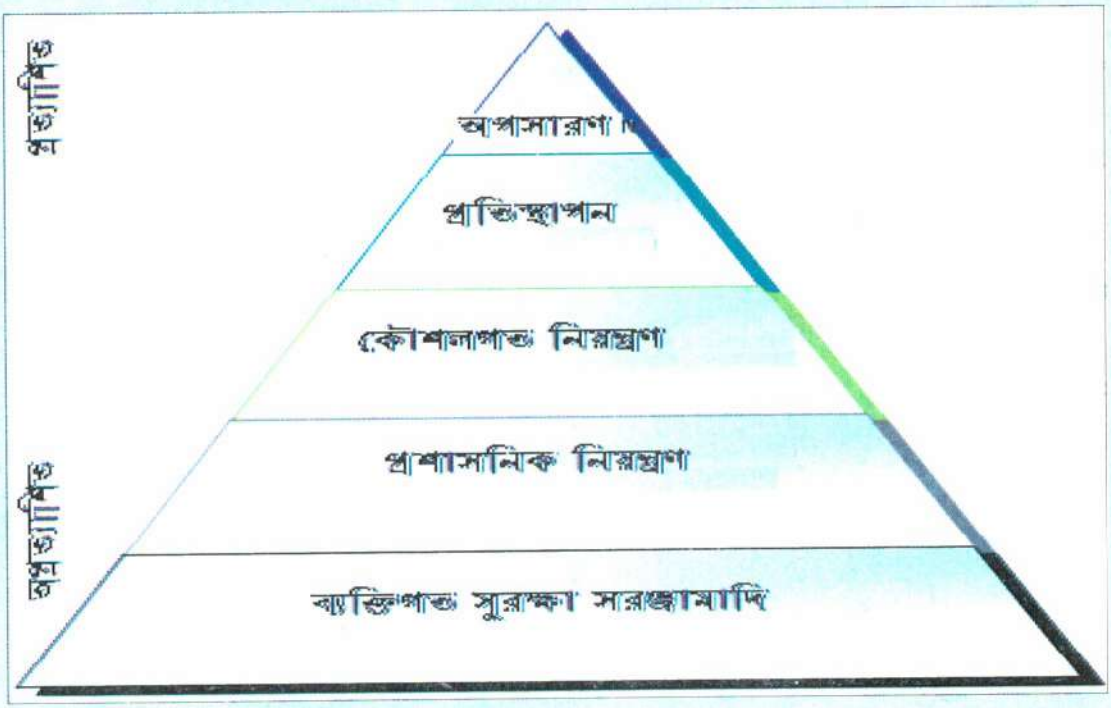

**বিপদ (Hazard) অপসারণ :-** ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্ভব হলে কোন বিপজ্জনক বস্তু, অবস্থা এবং কর্মপন্থা সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা উত্তম ।

**প্রতিস্থাপন:-** ঝুঁকি অপসারণ করা সম্ভব না হলে বিপজ্জনক বস্তু, অবস্থা এবং কর্মপন্থা এর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

**কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ:** উপরের দুই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । যেমন:

- যন্ত্রপাতি ও উপকরণ পরিবর্ধন/পরিবর্তন করা ।
- মেশিনারি নিরাপত্তা বেষ্টনী ও মেশিন গার্ড ব্যবহার করা ইত্যাদি ।

**প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ:** উপরের তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে প্রশাসনিক আদেশ, নির্দেশ, পদ্ধতি, অভ্যাস এবং নির্দেশনার মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।

**ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (PPE):** যখন কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না তখন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কারখানা কর্তৃপক্ষের শ্রমিকগণের দৈহিক গঠন ও কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সঠিক ও পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (PPE) সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং PPE সরবরাহ করার পর শ্রমিকগণ তা ব্যবহার করছে কিনা তা পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

**দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জাতীয় আইন ও নীতিমালা :**

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। ৫ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে কর্মক্ষেত্রকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও অন্যান্য জঞ্জাল থেকে মুক্ত রাখতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো, বায়ু চলাচল, সহনীয় তাপমাত্রার ব্যবস্থা ও পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ আইনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা কথা উল্লেখ করা আছে। এতে ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখা,সিঁড়ি ও যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত রাখা, অতিরিক্ত ওজন পরিহার করা, বিপজ্জনক ধোঁয়া, অতিরিক্ত ধুলা, বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। আর ৭ম অধ্যায়ে বিপজ্জনক চালনা ,দুর্ঘটনা ও কতিপয় ব্যাধিতে নোটিশ প্রদান সংক্রান্ত বিধান উল্লেখ করা আছে।

এছাড়াও এ আইনের ধারা ৮৮ তে বলা আছে, সরকার বিধি প্রনয়ণ করে যে কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত বিধান বা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবে।

অন্যদিকে, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ এ কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও তা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কৌশল বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে।

**উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায় কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে দেশে প্রচলিত আইন কানুন এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য নিয়মিতভাবে শ্রমিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, সেফটি কমিটি, অংশগ্রহণকারী কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, সরকারি প্রতিনিধি এবং এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আসুন সবাই মিলে আইন ও বিধান মেনে চলি, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করি ।

# সেফটি কমিটি ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন

**মোঃ আরিফুল ইসলাম**
উপ-মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, খুলনা

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় ৫০ বা তার বেশি শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োজিত থাকলে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। কারখানার কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন মালিকের আইনগত দায়িত্ব তেমনি উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ। একটি দূর্ঘটনা একটি কারখানার সমস্ত অর্জন বিনষ্ট করে দিতে পারে। যেকোন ক্ষুদ্র অবহেলা একটি বড় দূর্ঘটনার কারণ হতে পারে। সুতরাং কারখানার নিরাপত্তা বিধান একটি চলমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এসমস্ত বিষয় তদারকির জন্য সেফটি কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম। কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সেফটি কমিটির সদস্য সর্বনিম্ন ৬ ও সর্বোচ্চ ১২ জন হতে পারে।

একটি কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেফটি কমিটি বেশ কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে পারে।

১। কারখানায় দক্ষ, অভিজ্ঞ ও টেকনিক্যাল ব্যক্তিদের সেফটি কমিটির সদস্য করতে হবে।

২। সেফটি কমিটির সদস্য তাদের কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি চিহ্নিত করার জন্য নিজেদের মধ্যে এলাকা ভাগ করে নিতে পারে।

৩। চিহ্নিত ঝুঁকি সমূহ একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবে।

৪। ঝুঁকির মাত্রাসমূহ চিহ্নিত করবে এবং কোন ঝুঁকির কারণে কি ধরনের দূর্ঘটনা ঘটতে পারে তা চিহ্নিত করতে হবে।

৫। কারখানার ঝুঁকি ও দূর্ঘটনার সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করতে হবে এবং সচেতন করতে হবে ।

৬। যে সকল ঝুঁকির কারণে যেকোন সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং যে সকল ঝুঁকির কারণে দূর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি সে সকল বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশোধনীর ব্যবস্থা করতে হবে ।

৭। ঝুঁকির তালিকা, মাত্রা, দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য দূর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে নিয়মিত মালিককে অবহিত করতে হবে ।

৮। প্রত্যেকটি ঝুঁকি নিরসনের জন্য আলাদা সময়সূচী নির্ধারণ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন বিষয়ে ফলোআপ করতে হবে ।

৯। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কোন যন্ত্র, যন্ত্রাংশ বা কর্মক্ষেত্রে সংশোধনীর পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োজনে কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে ।

এবার ঝুঁকির মাত্রা সম্পর্কে কিছু ধারনা নেয়া যেতে পারেঃ-

কোন মেশিনের ঘূর্ণায়মান চাকার চারিদিকে একটি উপযুক্ত ঘেরা থাকা আবশ্যক যা সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে । উদাহরণঃ- ঘেরাটি মজবুত হতে হবে। ঘেরার ছিদ্রগুলো এমন ছোট হতে হবে যাতে কোন মানুষের হাত ছিদ্রে প্রবেশ করতে না পারে। ঘেরার ও ঘূর্ণায়মান চাকার দূরত্ব এমন হতে হবে যাতে আঙ্গুল প্রবেশ করালে চাকায় স্পর্শ না হয়।

**আর একটি বিষয়ঃ-**

কোন মেশিনের ঘূর্ণায়মান চাকা ততটাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ যদি-

১। চাকার আকার অপেক্ষাকৃত বড় হয়।

২। চাকার ওজন বেশি হয়।

৩। চাকার উপরিভাগ বেশি অমসৃণ বা কাটাযুক্ত থাকে।

৪। চাকার ঘূর্ণনগতি (RPM) বেশি হয়।

সুতরাং সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে কোন মেশিনের ঘূর্ণায়মান চাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে ।

কোন ইলেকট্রিক্যাল লাইন ততোবেশি ঝুঁকিপূর্ণ যদি-

১। তারের গুনগত মান খারাপ হয়।
২। তারের বয়স তুলনামূলক বেশি হয়।
৩। তারের উপাদান নিম্ন মানের হয়।
৪। ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং দূর্বল হয়।
৫। সক্ষমতার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশ হতে উন্নত দেশে পদার্পনের পথে আমাদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের বিকল্প নাই। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল আমাদের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করতে পারবো সুতরাং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর সাথে শ্রমিক মালিকের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।। নিরাপদ কর্মপরিবেশ, উন্নত বাংলাদেশ, এটাই হোক ভবিষ্যত বাংলাদেশের প্রত্যয়।

# পাথরভাঙা শিল্পে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও নিরাপত্তা

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি

**আপা আমাদেরকে বাঁচান, আর তো পারছি না- মমিন।**

মোঃ মমিন আলী, বয়স ৩০ বছর, পিতা- মোঃ সহিদার রহমান, গ্রাম- উফারমাড়া, ডাকঘর- বুড়িমারী ৫৫৪২, উপজেলা- পাটগ্রাম জেলা- লালমনিরহাট এর বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাথরভাঙা শ্রমিক হিসেবে প্রায় দুই বছর কাজ করেন। এক পর্যায়ে শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে পাথর ভাঙার কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে ঢাকা বক্ষব্যাধি হাসপাতালে পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর জানতে পারেন, তিনি মরণব্যাধি সিলিকোসিস এ আক্রান্ত। বর্তমানে তিনি অসুস্থাবস্থায় দিনযাপন করছেন এবং উপার্জনক্ষম কোন কাজ করতে না পারায় পরনির্ভরশীল হয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অসুস্থতার কারনে বর্তমানে তার প্রতিদিন ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার ঔষধ প্রয়োজন হয় কিন্তু টাকার অভাবে তাও সম্ভব হয়ে উঠে না। মমিন সিলিকোসিস এর সাথে যুদ্ধ করে এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু তার সাথের অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৫ জনের মত পাথরভাঙা শ্রমিক সিলিকোসিস এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। বুড়িমারি স্থলবন্দরে প্রায় ৫ শতাধিক মেশিনে অন্তত ৪ হাজার নারী-পুরুষ শ্রমিক কোন প্রকার সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া কাজ করছে (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০১৭)। অনিরাপদ কর্মক্ষেত্র শ্রমিকের কর্মক্ষমতা হ্রাস করছে, তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই এই শিল্পে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

**কেন এই পাথর ভাঙা?**

বাংলাদেশের লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নারায়নগঞ্জ, সিলেটের জাফলং এবং অন্যান্য আরো কিছু এলাকায় পাথরভাঙা শিল্প গড়ে উঠেছে। পাথর খুবই প্রয়োজনীয় একটি খনিজ উপাদান। রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, বাড়িঘর ইত্যাদিসহ

বিভিন্ন নির্মাণক্ষেত্রে পাথর ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পোল্ট্রি শিল্পে হাঁস মুরগির খাবার তৈরীর কাঁচামাল হিসেবে, মোজাইক পাথর তৈরী, সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল, সাদা সিমেন্ট তৈরী এবং টাইলস নির্মাণ ইত্যাদিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই শিল্পে হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োজিত আছে। কিন্তু কোন প্রকার সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া কাজ করার ফলে শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ধূলা-বালি সমৃদ্ধ সিলিকা কণা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে 'সিলিকোসিস' নামক মরণব্যাধি সৃষ্টি করছে। সিলিকোসিস একটি মারাত্মক পেশাগত ব্যাধি যার পরিণতি মৃত্যু। শুধু তা নয়, পাথর তুলতে গিয়েও নির্মম মৃত্যুর শিকার হচ্ছে শ্রমিকরা।

শ্রমিক না বাঁচলে শিল্প বাঁচবে না। এই বিষয়টি না বোধগম্য হলে দিনের পর দিন শ্রমিকরা কর্মক্ষমতা হারাবেন, আর দেশ হারাবে তার চালিকা শক্তি । বাংলাদেশে শিল্পের ইতিহাস বেশিদিনের নয় । শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন সুস্থ সবল শ্রমিকদল। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলছে। অতীতে

এই বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। দুঃখজনক হলেও সত্যি, তাজরীন ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। পোশাকশিল্পে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং বেশ অগ্রগতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না। বাংলাদেশে বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র রয়েছে, যেমন নির্মাণ, জাহাজভাঙা, রি-রোলিং মিল, পাথরভাঙ্গা, ট্যানারি ইত্যাদি।

**এমনই কি চলবে?**

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, আইনি সহায়তা, এ্যাডভোকেসি এবং অনুরূপ ধরনের সেবার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু ও জখমের জন্য নির্ভরশীল পরিবার ও আহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ লাভে সহায়তা করা, মৃত্যু বা আঘাত সংক্রান্ত কোনো চিকিৎসা বা অন্যান্য খরচ পরিশোধের জন্য আহত শ্রমিক ও নির্ভরশীল পরিবারের জন্য শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে সাহায্য করা, আহত শ্রমিকদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা ইত্যাদি কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছে। এসআরএস বর্ণিত পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরে আক্রান্ত শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করে এবং পেশাগত ব্যাধির বিষয়ে নিশ্চিত হয়।

তারই ধারাবাহিকতায় এসআরএস বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ৪৩ জন সিলিকোসিস এ আক্রান্ত শ্রমিক ও ২২ জন সিলিকোসিস এ আক্রান্ত নিহত শ্রমিকের প্রতিনিধিকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা এবং ৯৪ জন শ্রমিককে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য এসআরএস সহযোগিতা করেছে। তার মধ্যে ৮ জন শ্রমিক ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা করে মোট ৩,২০,০০০/- (তিন লক্ষ বিশ হাজার মাত্র) টাকা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে গ্রহণ করেছে। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রতিবছর আলোচনা সভার আয়োজন করছে।

বুড়িমারি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে ২০১৭ সালে দুই দিনব্যাপি হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা করেছে। সিলিকোসিস এ আক্রান্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরামর্শ প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধ সামগ্রী বিতরণ এবং একটি করে উন্নতমানের রেসপিউরেটরী মাস্ক প্রদান করেছে। প্রায় ৩০০ জন ব্যাক্তি এই স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছেন। শুধুমাত্র লালমনিরহাট এলকাই নয়, এসআরএস চেষ্টা করছে অন্যন্য এলাকাতে যেখানে পাথরভাঙ্গার কাজ হচ্ছে সেখানেও কাজ করার জন্য। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রথম থেকেই আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করে আসছে।

**পাথর ভাঙার সঠিক পদ্ধতি**

এসআরএস পাথরভাঙা শিল্পটিকে শ্রমিকের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। যদিও অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তারপরও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে পাশে নিয়ে এসআরএস এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। সঠিক পদ্ধতিতে পাথর ভাঙলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহৃত হলে মরণব্যাধি সিলিকোসিস থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর অনেক স্থানেই পাথর ভাঙা শিল্প গড়ে উঠেছে। তারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পাথর ভাঙার ফলে কম সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে। একমাত্র নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে-

১. পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পাথর ভাঙ্গা- পাথর ভাঙার সময় পানির ব্যবহার ধূলাবালি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

২. ধূলা-বালির কার্যকর নির্গমনের জন্য 'ডাস্ট সাকার' সহ উপযুক্ত নির্গমন যন্ত্র স্থাপন করা- পানির অপর্যাপ্ততায় ধূলা-বালি নিয়ন্ত্রণে ডাস্ট সাকার বা উপযুক্ত নির্গমন যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। ডাস্ট সাকার ধূলা-বালি শোষণ করে শ্রমিককে সুস্থ্য থাকতে সহায়তা করবে।

চিত্র-১

চিত্র-২

৩. খোলা যায়গায় পাথর না ভাঙা- যেখানে সেখানে ছোট মেশিন দিয়ে পাথর না ভাঙা।

৪. অবশ্যই পাথর ভাঙার সময় শ্রমিকরা উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করবে। মাস্ক ব্যবহার ফুসফুসের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাথর ভাঙা এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারই পারে এই মরণব্যাধি সিলিকোসিস রোধ করতে।

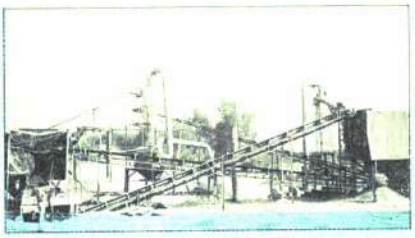

চিত্র-৩

চিত্র-৪

**শ্রম আইনে পেশাগত ব্যাধি**

কোন শ্রমিক মালিকের অধীনে নিযুক্ত বা অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যূনতম ৬ মাস তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কাজ করাকালীন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তা কোন দুর্ঘটনার ফলে জখম বলে গণ্য হবে এবং এই দুর্ঘটনা চাকুরি চলাকালীন তা থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য হবে। কোন চাকুরিকাল অবিচ্ছিন বলে গণ্য হবে যদি তার সাথে অন্য কোন মালিকের অধীন একই প্রকার কোন চাকুরি যুক্ত না থাকে। আর যদি একই কাজ অন্য মালিকের অধীনে করা হয় তাহলে অবিচ্ছিন্নকাল তখন থেকে ধরা হবে। পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে মালিক নিজের খরচে চিকিৎসা করাবে এবং সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত মজুরি প্রাপ্য। এর মধ্যে প্রথম দুই মাস সম্পূর্ণ, পরের দুই মাস মূল মজুরির দুই-তৃতীয়াংশ এবং বাকী সময় অর্ধেক হারে মজুরি পাবে। এমনকি বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম অধ্যায়ে শ্রমিকের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে। ধারা ৫৩ তে ধূলা-বালি ও ধোঁয়া থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে তার দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া ২য় তফসিলে উল্লেখিত ব্যাধিতে শ্রমিকরা আক্রান্ত হলে মালিক অথবা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক শ্রম পরিদর্শককে অবহিত করবে এবং সেই মারফত তদন্তের নির্দেশ প্রদান এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

**বিরাজমান অবস্থা**

অপর্যাপ্ত পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের অবহেলা, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, মালিকদের অনাগ্রহতা, অতিরিক্ত খরচের ভয় ইত্যাদি কারনে পাথরভাঙ্গা শিল্পটি শোভন কর্মপরিবেশ গঠনে এগিয়ে যেতে পারছেনা। বর্তমানে পাথরভাঙা এলাকাতে শুধু শ্রমিকরাই ঝুঁকির সম্মুখিন নয়, আশেপাশের সাধারণ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধরাও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু যে শ্রমিকরা ঐ পরিবেশে কর্মঘন্টার পুরোটা সময় কাটান তাদের ঝুঁকি সাধারণ জনগণের তুলনায় বেশি। প্রতিটি কর্মক্ষেত্র স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ হবে এই প্রচেষ্টাতেই এসআরএস কাজ করে চলেছে। উন্মুক্ত অবস্থায় ছোট ছোট মেশিনে পাথর ভাঙ্গা হচ্ছে। পরিদর্শনের আগে কে বা কারা খবরটি মালিককে জানিয়ে দেন এবং সাথে সাথে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কাজের সময় পুরো এলাকাটি ধূলো-বালিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য বুড়িমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিছুটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নিয়োগকর্তার সামান্য সহযোগিতাই পারে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ গড়তে।

অন্যদিকে, সিলেটের বিভিন্ন পাথর কোয়ারিতে গত ১৩ মাসে পাথর তুলতে গিয়ে ৫৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মার্চ ২০১৮)। পঞ্চগড়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় ৫০ হাজার পাথর শ্রমিক। তারা সবাই কেউ পাথর উত্তোলন, কেউ পাথর সর্টিং, আবার কেউ মেশিনে পাথর ভাঙার কাজের সাথে জড়িত। কাজ করাকালীন তারা কোন প্রকার সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করেন না। ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা শ্বাসকষ্ট, জ্বর, অনিদ্রা, ক্ষুধামন্দা, বুকে ব্যাথা ইত্যাদি দেখা দেয়। এক পর্যায়ে তা পেশাগত ব্যাধি সিলিকোসিস এ রুপ নেয় এবং তখন আর কিছু করার থাকে না। তখন অসহয়ের মত এই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষগুলোর তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। নারায়নগঞ্জেও গড়ে উঠেছে পাথর ভাঙার ফ্যাক্টরী। এই সেক্টরে কাজের মাধ্যমে লক্ষাধিক শ্রমিক জীবিকা নির্বাহ করছে এবং রয়েছে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকির মাঝে।

**করণীয়**

পাথরভাঙা শ্রমে নিয়োজিত শ্রমিক আমার আপনার মতোই মানুষ। তাদের সুস্থ্যভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে। একটি শিল্প থেকে সরকার, মালিক, শ্রমিক এবং জনসাধারণ সবাই উপকৃত হয়। তাই এই শিল্পকে সঠিকভাবে চালাতে করণীয় হল-

- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং নিয়ন্ত্রিত কারখানা স্থাপন করতে হবে। উম্মুক্ত পদ্ধতিতে পাথর ভাঙা যাবে না;
- পরিবেশ অধিদপ্তর এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ব্যতিত কারখানা স্থাপন করা যাবে না;
- নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পাথরভাঙা নিশ্চিত করতে হবে;
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে এবং তা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- বছরে অন্তত একবার রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের মাধ্যমে কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে;
- সিলিকোসিসে আক্রান্ত হলে অবিলম্বে কাজ ছেড়ে দিয়ে সঠিক চিকিৎসা নিতে হবে;
- শ্রমিকের চিকিৎসার সকল ব্যয়ভার মালিককে বহন করতে হবে;
- সঠিক পদ্ধতিতে কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;
- মালিক ও শ্রমিক উভয়কেই কাজের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে;
- এই কারখানাগুলোর উপর মনিটরিং জোরদার করতে হবে, শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে;
- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা ও আবেদনের প্রক্রিয়া সহজ করা।

পরিশেষে, আমরা চাই না একটি সম্ভাবনাময় শিল্প শুধুমাত্র পরিচালনা প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে ক্ষতির সম্মুখিন হোক। অতীতের অনেক ফ্যাক্টরী মালিক ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় পরিবর্তনের যে হাওয়া লেগেছে, ঠিক সেইভাবে পাথরভাঙ্গা শিল্পেও সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করছি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবসে প্রতিটি কর্মক্ষেত্র স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ হবে এই আমাদের সবার প্রত্যাশা। শিল্পের উন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। পোশাকশিল্প যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই পাথরভাঙা শিল্পটিও একটি পরিবেশবান্ধব ও শ্রমিকবান্ধব শিল্প হিসেবে রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি করবে এবং সামনে এগিয়ে যাবে।

## পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি

# শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন

**পিংকি মজুমদার**
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা

পৃথিবী সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। 'উন্নয়ন' শব্দটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কাগজে কলমে পরিচিত হলেও আদিম যুগ থেকেই বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সু-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় যাকে মূলত 'উন্নয়ন' বলেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। গোষ্ঠিগত চিন্তাধারা থেকে সমাজ ব্যবস্থার সূচনায় নারী পুরুষের সহাবস্থান ও সমমর্যাদা পরিলক্ষিত হয় শুধু জীবনধারণ অর্থাৎ বেঁচে থাকার তাগিদে। সামাজিক কাঠামোতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদ ক্রমাগত বাড়তে থাকে যা সমাজই তৈরী করে। যার ফলশ্রুতিতে, আধুনিক যুগে আমরা 'equality' এবং 'equity', এর মত শব্দগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। 'Equality'শব্দটি নারী পুরুষের সমতার কথাটি বলে এবং 'equity' শব্দটি তৈরী হয় 'equality' শব্দটিকে বাস্তবে রূপ দিতে অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যে অসমতার ২০০ বা ৫০০ বছরের gap টিকে কমিয়ে নারীদের বাড়তি সুবিধা প্রদান করে 'mainstream' শব্দটিকে উজ্জ্বল করে তোলা। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা টেকসই অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নিশ্চিতকরণ একটি আধুনিক ও যুগোপযোগি পদক্ষেপ।

এরই ধারাবাহিকতায় শ্রমবাজারে নারীর টেকসই অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বাংলাদেশ 'Demographic Dividend' এর যে সুবর্ণ সুযোগ তৈরী হয়েছে সেটিকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে-

Perspective Plan (2010-2021)
6th Five Year Plan (2011-2015)
৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - জেন্ডার বৈষম্য কমানো, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে।

7th Five Year Plan (2016-2020)
৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
SDG – Agenda-2030 যার প্রধান বার্তা-

''People, Planet, Prosper, peace and partnership SDG এর ১৭টি Goal এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্বের দাবী রাখে।

Goal-3- Good health and well being.
Goal-5- Gender equality.
Goal-6- Clean Water and Sanitation.
Goal-8- Decent Work and Economic Growth.
Goal-10- Reduced inequality .
Goal-16- Peace, Justice and strong institution.

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় বর্তমান সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন এবং ৮০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রনীত হয়েছে। 'Healthy Work Place' Decent Work' and Green Jobs এই শব্দগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করেই বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, সংশোধন (২০১৩) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে-

* জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩
* জাতীয় OSH Council গঠন।
* OSH Kit প্রণয়ন।
* OSH Unit গঠন।
* ২০১৬ সাল থেকে ২৮ এপ্রিল জাতীয়ভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন।

'equality, এবং 'equity এর বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান পূর্বক নারীর পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিবেচনায় বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ৪৫-৫০ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ৩৭-৩৯ এ প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার কথা বলা হয়েছে-

### প্রসূতিকল্যাণ

* সন্তান সম্ভাবা নারী শ্রমিকের ছুটিভোগ এবং ছুটিভোগকালীন প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান
* ঝুঁকিপূর্ণ, দুষ্কর ও শ্রমসাধ্য কাজ থেকে বিরত রাখা।
* কর্মকালীন লিফট ব্যবহারের অগ্রাধিকার প্রদান করা।
* সন্তানসম্ভবা নারীর সাথে এমন আচরণ না করা যাতে ঐ নারী শারিরীক ও মানসিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়।

### নারীর সীমিত কর্মঘন্টা

বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ এর ১০৯ ধারায় বলা হয়েছে নারীর বিনা অনুমতিতে রাত ১০টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না।

### নারীর স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান

কোন কর্ম (বিধি ৬৮ এ উপবিধি ১ এ বর্ণিত কর্মসমূহ) পরিচালণায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সংঘাতিক শারীরিক জখম, বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে নারী, কিশোর এবং শিশুদের উক্ত কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

### কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৮৯-৯৯ ধারা এবং শ্রমবিধি এর ৭৬-৯৮ এ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ বিধান রয়েছে যেখানে নারী শ্রমিকের জন্য বিশেষ বিধান নিম্নরূপ-

মানসম্মত শিশুকক্ষ- চল্লিশ বা ততোধিক নারী শ্রমিক নিয়োজিত থাকলে তাদের ৬ বছরের কম বয়সী শিশু সন্তানদের জন্য এক বা একাধিক শিশুকক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি শিশুর জন্য প্রতিদিন ০.২৫ লিটার দুধ এবং পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মরত শ্রমিকগনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত গোসলখানা ও ধৌতকরণ সুবিধা- নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখতে হবে। নারীর বিশ্রাম কক্ষ আলাদাভাবে পর্দাদিয়ে ঘেরা থাকবে।

এছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমান পদক্ষেপ হিসেবে এ্যান্টি হ্যারেজমেন্ট কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। বিশেষকরে নারী শ্রমিকেরা যাতে কোন যৌন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

**শ্রমবাজারের নারীর অংগ্রহণ বৃদ্ধি : চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা-**

* নারী শ্রমিকের অর্জিত অর্থের প্রতি এবং তা খরচের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা। বর্তমান সামাজিক পেক্ষাপট বিবেচনায় নারীর আয়ের খরচ করার অধিকার হিসেবে স্বামীরাই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অর্জিত অর্থ নারী তার ও তার সন্তানের জন্য প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে না।
* মানসম্মত শিশুকক্ষের অভাবে অনেক নারী শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারে না কারণ সন্তানকে দেখাশোনার কাজটি নারীকেই করতে হয়।
* নারীর প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা প্রাপ্তি প্রধান অন্তরায় হলো সন্তান প্রসবের পর নারীকে পুনরায় কাজে যোগদান করতে নিরুৎসাহিত করা, সুবিধাপ্রাপ্তির অর্থের হিসাবটি সম্পর্কে অস্পষ্টতা রাখা বা সঠিক তথ্য না দেওয়া বা শুধু প্রথম ৫৬ দিনের টাকা প্রদান করে প্রাপ্তিস্বীকার পত্রে স্বাক্ষর নিয়ে নেওয়া।
* সামাজিক বাঁধা নিষেধ এবং চাকুরিচ্যুতি হওয়ার ভয়ে যৌন হয়রানীর স্বীকার হলেও নারী শ্রমিকেরা মুখ খুলতে চায় না।

**সুপারিশ**

* কাজের ধরণ অনুযায়ী নারী শ্রমঘন কারখানাগুলো চিহ্নিতকরণ, সার্ভে পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিক উভয়ই উপকৃত হয়ে উৎপাদন গতি ত্বরান্বিত করবে।
* উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে যৌন হয়রানি মূলক সচেতনতা বৃদ্ধি। এ ধরণের কোন নির্যাতনের শিকার হলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে জানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা যাতে নারীরা আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করতে পারে। এই সভায় একজন পুরুষ শ্রমিক অথবা মালিককে কথা বলতে দেওয়া যাতে অন্য পুরুষেরা তাদেরকে অনুসরণ করে এবং সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে সমাধানে উদ্যোগী হয়।
* কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সেইফটি কমিটি এবং সক্রিয় পার্টিসিপেশন কমিটি নিশ্চিতকরণ এবং নারী সদস্য উপস্থিতি বাধ্যতামূলক এবং নারী কল্যাণ কর্মকর্তা নিশ্চিতকরণ।

**পরিশেষে**

নারীর জন্য বাড়তি দৃষ্টি কখনও নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ তৈরী করে না বরং বৈষম্যকে হ্রাস করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়। বৈষম্যের এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নয় বরং গুরুত্বের সাথে বিচার করে নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থানে মানবিক মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠা করা। শুধু সাদা চোখে নয় বরং বিবেক দিয়ে দেখা, শোনা ও অনুভবের মাধ্যমে নতুনভাবে নারীর পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টি উত্থাপন করে জাতীয় সংস্কৃতিতে পরিনত করা যেখানে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই সমঅধিকার, সমমর্যাদায় একটি আধুনিক যুগোপযোগি উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত হয়। বর্তমান Demographic Dividend কে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে শ্রম বাজারে নারীর ক্রমাগত অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনিবার্য। নতুন সমাজ ব্যবস্থাই তৈরী করবে নতুন পৃথিবী- এ প্রত্যাশায় ২৮ এপ্রিল পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৮ সফল হোক।

# পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার ২০১৭
# এর জন্য চূড়ান্ত মনোনীত
# ১০ টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

# ইকোটেক্স লিমিটেড

চন্দ্রা (পল্লীবিদ্যুৎ), কালিয়াকৈর, গাজিপুর।
প্রতিষ্ঠা সাল : ২০০৮, শ্রমিক সংখ্যা : ৯২৭০ জন

**শফিকুল হাসান**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

উন্নয়শীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পড়তে ইকোটেক্স লিমিটেড সর্বদা সচেষ্ট। কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম মজুরি, মৃত্যুজনিত সুবিধা, স্বেচ্ছাবসর সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং শিশুকক্ষ রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স, প্রাথমিক চিকিৎসা দল, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সকল স্বাস্থ্য সেবার সুব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবন্ধী শ্রমিকদেরকে অগ্রাধিকার সুবিধা প্রদান করা হয়। কারখানায় স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবং ইলেক্ট্রিক্যাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ রয়েছে। কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ সুনির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ এবং তা ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অপরিহার্য পালনের প্রতিটি বিষয় যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকগণ সচেষ্ট রয়েছেন।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী যেকোন দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সকল তথ্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। কারখানাটিতে পেশাগত রোগ প্রতিরোধ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত ঝুঁকি নিরুপণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেশিনে নিরাপত্তা নির্দেশিকা ইত্যাদি ঝোলানো হয়েছে। ভবিষ্যৎ তহবিলের জমাকৃত অর্থ প্রাপ্যতার বিধান রয়েছে।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

কারখানাটির কর্মক্ষেত্রে আলো, বাতাস, আরামদায়ক তাপমাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ পরিবেশ বান্ধব মেশিন ও বিভিন্ন স্থাপনা করেছেন। শ্রমিকদের পেশাগত রোগ, ব্যাধি নিরাময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রম

ইকোটেক্স শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা, গ্রাচুইটি, প্রতি কর্মদিবসে বিনামূল্যে দুপুরের খাবার, বিনালাভে পরিচালিত দোকান ব্যবস্থায় মুদি সামগ্রী ক্রয়ের সুবিধা প্রদান, পুরুষ শ্রমিকদের ০৭ দিনের পিতৃত্বকালীন ছুটি, গর্ভবতী মহিলাদের বিনামূল্যে আল্ট্রাসনোগ্রাফি, গর্ভকালীন ঔষধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন সুবিধা, শ্রমিকদের সন্তানদের পড়ালেখার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন, উৎপাদন বোনাস, হাজিরা বোনাস, আচরণ বোনাস এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও লিংগ বৈষম্য দূরীকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইকোটেক্স লিমিটেড শ্রমিকদের একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পরিবেশের অনুশীলন উন্নত করার প্রত্যয় নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

# উইজডম এ্যাটায়ার্স লিঃ

দাপা, ইদ্রাকপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
প্রতিষ্ঠা সাল : ১৯৯৬, শ্রমিক সংখ্যা : ৩১১৫ জন

**নাসরীন ওসমান**
পরিচালক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

উইজডম এ্যাটায়ার্স লিঃ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান এবং পরিবেশ সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। কারখানাটিতে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র বিবেচনায় উপযুক্ত পি পি ই'র ব্যবহার, মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান, মানসম্মত ডেকেয়ার সেন্টারসহ যাবতীয় সুবিধা প্রতিপালন এবং শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া শ্রমিকদের কর্ম নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কারখানা কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। পরিবেশবান্ধব কারখানা নিশ্চিতকল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নত প্রযুক্তির নান্দনিক সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উইজডম এ্যাটায়ার্স লিঃ একটি আদর্শ নীট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার বিধান বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

কারখানাটির সকল শ্রমিক/কর্মচারী এবং কর্মকর্তাগণের ক্ষতিপূরণমূলক বীমা, মেডিকেল সার্ভিস, মুনাফাবিহীন ক্যান্টিন সুবিধা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, বোনাস ও উৎসবে অতিরিক্ত ছুটি প্রদানসহ শ্রমিকদের জন্য নানাবিধ চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত এস ডি জি এর অনুকরণে আধুনিক পরিবেশসম্মত শিল্পায়ন জরুরি। এ পরিপ্রেক্ষিতে উইজডম এ্যাটায়ার্স লিঃ সবুজ শিল্পায়ন নিশ্চিতকল্পে সকল প্রকার পরিবেশ আইনের বাধ্যবাধকতা মেনেই ইটিপি এর মাধ্যমে ডায়িং নিশ্চিত করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিশোধিত পানি উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট করে শোধনাগার থেকে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে থাকে।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রম

শ্রমিকের জন্য টেকসই কর্মজীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি নানামুখী উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কারখানাটিতে পেশাগত ব্যধি রোধে নিয়মিতভাবে বছরে দুইবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং আক্রান্ত শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, সার্ভিস কার্ড প্রদান, এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসসহ নানামুখী উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

# একেএইচ ইকো অ্যাপারেলস

৪৯৫, বালিথা, শাহ-বেলিশ্বর, ধামরাই, ঢাকা-১৮০০।
প্রতিষ্ঠা সাল : ২০১৫, শ্রমিক সংখ্যা : ৫৩০০ জন

**মোঃ শামসুল আলম**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে টিকে থাকতে একেএইচ ইকো অ্যাপারেলস কর্তৃপক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ শূন্য-সহনশীল নীতি মেনে চলেন। কারখানার স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেকট্রিক্যাল সেফটির সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করা হয়েছে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত ফায়ার ড্রিল করানো হয়। শ্রমিক নিয়োগ, কর্মঘণ্টা, ছুটি প্রদান, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা প্রদান বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার বিধান মোতাবেক করা হয়। মানসম্মত শিশুকক্ষের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সেবার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। কারখানার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সব সময় সচেষ্ট থাকে।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

অসুস্থ শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্যলাভ করা পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। সুস্থ হয়ে কাজে ফেরার পর তাদের হালকা কাজ দেয়া হয় ও নিয়মিত চেকআপ এর ব্যবস্থা করা হয়। কারখানার মেডিকেল সেন্টারে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের জন্যও এই সুবিধা প্রণয়ন করার পরিকল্পনা আছে। শ্রমিকেরা ছুটিতে থাকাকালীন তাদেরকে মজুরি নিয়মিত প্রদান করা হয়।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় সকল আইন, পরিবেশগত আইনসমূহ মেনে চলা হয়। একেএইচ ইকো অ্যাপারেলস US GBC Certified "Gold" Factory। পরিশোধিত বর্জ্য জৈবসার হিসেবে বাগানে ব্যবহার করা হয়। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাসহ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রম

শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য পছন্দমত গান বাজানো হয়। বাংলাদেশের ক্রিকেট ম্যাচের ধারাভাষ্য FM এর মাধ্যমে শ্রমিকদের শুনানো হয়। প্রতি বছর বনভোজন আয়োজন করা হয়। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

# তারাসিমা অ্যাপারেলস লিঃ

গ্রামঃ গোলড়া, পোষ্টঃ কৈটটা, থানা- সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।
প্রতিষ্ঠা সাল : ২০০৭, শ্রমিক সংখ্যা : ৬৯৭১ জন

**মোঃ মিরান আলী**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারাসিমা অ্যাপারেলস লিঃ তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ ও ছুটি প্রদান করা হয় এবং শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত কর্মঘন্টা বাস্তবায়ন করা হয়। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা প্রদান এবং মানসম্মত শিশু কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার জন্য নিজস্ব স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। কারখানাটিতে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন কর্মপরিবেশ বিরাজমান। কারখানাটির কোন ভবন, অংশবিশেষ, চলাচলের পথ বা যন্ত্র জীবন ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়। কারখানায় একটি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া এখানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তারাসিমা অ্যাপারেলস লিঃ এর পক্ষ থেকে আক্রান্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্যলাভ পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং আইনানুগ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করা হয়। শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে কার্যকর সেইফটি কমিটি রয়েছে। কর্মীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

পরিবেশ দূষণ রোধে তারাসিমা অ্যাপারেলস লিঃ সর্বদা বদ্ধপরিকর। অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও LEED সনদপ্রাপ্ত এই কারখানা কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার সাথে সাথে পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে সচেতন। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য Energy Efficient ফ্যান, স্কাই লাইট, সোলার লাইট, LED লাইট, Biogas Plant ব্যবহার করা হয়।

**উদ্ভাবনী কার্যক্রম :** তারাসিমা অ্যাপারেলস লিঃ নানামুখী উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় রক্তদান কর্মসূচি, Child care centre, বৃক্ষরোপণের মত উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

# নীট কনসার্ন লিঃ

৬২, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০।
প্রতিষ্ঠা সাল : ১৯৯০, শ্রমিক সংখ্যা : ৫৫০৭

**মোঃ জয়নাল আবেদীন মোল্লা**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

শ্রমিকের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নীট কনসার্ন লিঃ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ ও ছুটি প্রদান করা হয়। উৎসব ছুটি ১১ দিনের পরিবর্তে ১৩ দিন প্রদান করা হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ ছুটি ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও কারখানাটিতে শিশুকক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার জন্য রয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। শ্রমিকদেরকে নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অপরিহার্য প্রতিপালনের প্রতিটি বিষয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারখানা কর্তৃপক্ষের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

এই কারখানা পরিবেশগত সকল আইন ও নিয়মকানুন মেনে চলে। কারখানাটিতে সৃষ্ট রাসায়নিক মিশ্রিত বর্জ্য পানি নিজস্ব শোধনাগারে পরিপূর্ণ শোধন-পূর্বক জলাধারে নিঃসরণ করে।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

নীট কনসার্ন লিঃ কারখানাটিতে সকল শ্রমিকের জন্য গ্রুপবিমা সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ব্যবহার, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, ঝুঁকি নির্ধারণ, রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ওয়েস্ট ওয়াটার ব্যবস্থাপনা, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপর সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কারখানাটিতে সকল শ্রমিকের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং গরমের সময় শরবত ও খাবার স্যালাইনের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকদের জন্য একটি ক্যান্টিন ও একটি ডাইনিং হলের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রম

নীট কনসার্ন লিঃ কর্মরত উচ্চমাধ্যমিক পাশ মহিলা শ্রমিকদের মধ্য থেকে ৭ জনকে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য জন্য Asian University for Women, চট্টগ্রাম এ প্রেরণ করেছে। অধ্যয়নকালীন তারা নিয়মিত বেতন-ভাতা পাবেন এবং অধ্যয়ন শেষে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারবেন অথবা বর্তমান প্রতিষ্ঠানে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে যোগদান করতে পারবেন। কারখানাটিতে নিয়োজিত শ্রমিকের সন্তানদের পড়াশোনায় ভাল ফলাফল করার জন্য এককালীন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে থাকে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত অসহায় গরিব মানুষদের আর্থিকভাবে সহায়তার জন্য মাসিক ১০০০/- টাকা হিসেবে মোট ২৮ জনকে ভাতা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটির দুই পাশের এলাকার মানুষের জন্য দুইটি খাবার পানির ট্যাপের ব্যবস্থা আছে।

# ফকির ফ্যাশন লিঃ

ডহরগাও, বালিয়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
প্রতিষ্ঠা সাল : ২০০৯, শ্রমিক সংখ্যা : ৮৭০০ জন

মোঃ ফকির কামরুজ্জামান নাহিদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

শোভন কর্মপরিবেশ শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে একটি। সে লক্ষ্যে কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ, কর্মঘন্টা ও ছুটি প্রদান করা হয়। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা প্রদান এবং মানসম্মত শিশু কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োজিত আছে। স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন কর্মপরিবেশ বিরাজমান। কারখানার স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেকট্রিক্যাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান। শ্রমিকদেরকে নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অপরিহার্য প্রতিপালনের প্রতিটি বিষয়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারখানায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের প্রামাণিক তথ্য রয়েছে।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

এখানে নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামসহ বাক্স, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও শয্যাসহ চিকিৎসাকেন্দ্র ও অ্যাম্বুলেন্স এর সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা আছে এবং কারখানাটি নিকটবর্তী হাসপাতালের সাথে চুক্তিবদ্ধ। দুর্ঘটনায় আক্রান্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্যলাভ করা পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে মালিক আন্তরিক। সকল শ্রমিকদের জন্য গ্রুপবীমা সুবিধা বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ তহবিল ব্যবস্থা শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা হবে।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

কারখানা ও এর আশপাশের এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কার্যকর ইটিপি, সুপেয় পানির ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে "Energy Saving & Zero Discharge Program" গ্রহণ করা হয়েছে।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রম

শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টার ও Better Work Bangladesh এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পেশাগত ব্যধি রোধে কারখানা নিজস্ব অর্থায়নে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় কর্মরত শ্রমিকদের প্রতি বছর বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ফকির ফ্যাশন লিঃ OHSAS-18001 Standard সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে। চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শ্রেণির জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে। "Green Agro Project" এর মাধ্যমে কর্মীদের ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় নানমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

# ভিয়েলাটেক্স লিঃ

২৯৭, খড়তৈল , গাজিপুরা, টঙ্গি, গাজীপুর
প্রতিষ্ঠা সাল : ২০০১, শ্রমিক সংখ্যা : ৬২০০ জন

**এ কে এম রেজাউল হাসনাত**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

ভিয়েলাটেক্স লিঃ বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য তৈরি পোশাক কারখানা। শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রতিষ্ঠানটি বদ্ধপরিকর। তারা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ যথাযথভাবে মেনে চলে এবং আইনে নির্দেশিত সকল সুবিধা নিশ্চিত করে। শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া অপ্রত্যাশিতভাবে কোন দুর্ঘটনার শিকার হলে ক্ষতিপূরণ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান ইত্যাদি নিশ্চিত করে থাকে। রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে কাজ করে এমন শ্রমিকদের শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এ উল্লিখিত সকল নির্দেশনা পালনে ভিয়েলাটেক্স লিঃ কর্তৃপক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি শ্রমিক এর কাজে যোগদানের পূর্বে অরিয়েনটেশন প্রদান করা হয় এবং নিয়োজিত শ্রমিকদের ট্রেনিং এর মাধ্যমে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিক/কর্মচারী এবং কর্মকর্তাগণের মেডিকেল সার্ভিস, বিশুদ্ধ খাবার পানি, বোনাস ও উৎসবে অতিরিক্ত ছুটি প্রদানসহ শ্রমিকদের জন্য নানাবিধ চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

পরিবেশগত দূষণরোধে এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরনে ভিয়েলাটেক্স প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পেশাগত রোগব্যাধি রোধ করার জন্য প্রযোজ্য ব্যক্তিদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রম

শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারখানাটি বেশ কিছু উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফ্যাক্টরী নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩ মাস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া শারীরিক প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিকাশ স্কুল। গর্ভবতী শ্রমিকদের বিনামূল্যে ক্যালসিয়াম, আয়রন ট্যাবলেটসহ আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পেশাগত ব্যাধি রোধে কারখানার নিজস্ব অর্থায়নে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রতি বছর বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকে।

# স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড

জামিরদিয়া, হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
প্রতিষ্ঠা সাল : ২০০১, শ্রমিক সংখ্যা : ৯৬৭৮ জন

**তপন চৌধুরী**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

স্কয়ার ফ্যাশন লিমিটেড দেশের প্রচলিত বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালাসহ সকল বিধি বিধান অনুসরন করে পরিচালিত একটি শ্রমবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিতে আইন অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগপত্র প্রদান, পরিচয়পত্র, চাকুরি স্থায়ীকরণ, সার্ভিস বুক, মুল্যায়ন, ইনক্রিমেন্ট, বোনাস ও ছুটি প্রদান করা হয়। এছাড়া শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত কর্মঘন্টা বাস্তবায়ন করা হয়। কারখানাটিতে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা প্রদান এবং মানসম্মত শিশু কক্ষ, ক্ষতিপূরণ এবং চাকুরি ছেদ জনিত কারণে আইনানুগ পাওনা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ সকল ক্ষেত্রে আইন ও বিধি অনুসরন করা হয়। শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র বিবেচনায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ফ্লোর, বিনামূল্যে খাবার প্রদান, ২০০০ শ্রমিকের আবাসন প্রদান, বিনামূল্যে পরিবহন ব্যবস্থা, ফেয়ার প্রাইস শপ, বিনামূল্যে চিকিৎসা, নিজস্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঝুঁকি প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধীদের চাকুরি প্রদান, আবাসন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, রাসায়নিক পদার্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, বয়লার ও জেনেরেটরের যথাযথ ব্যবস্থাপনাসহ কারখানার সার্বিক নিরাপত্তা (স্ট্রাকচারাল, ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল) ব্যবস্থা বিধান মোতাবেক করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কারখানা কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

কারখানাটির সকল শ্রমিক/ কর্মচারী এবং কর্মকর্তাগণের গ্রুপবীমা, মেডিকেল সার্ভিস, ক্ষতিপূরণ প্রদান, প্রশিক্ষণ, কোম্পানি মুনাফা প্রদান, বিশুদ্ধ খাবার পানি, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ শ্রমিকদের জন্য নানাবিধ চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

স্কয়ার ফ্যাশন লিমিটেড সবুজ শিল্পায়ন নিশ্চিতকল্পে সকল প্রকার পরিবেশ আইনের বাধ্যবাধকতা মেনেই ইটিপি এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন করছে। সেই সাথে পরিশোধিত পানি উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট করে শোধনাগার থেকে নিষ্কাশন করা হয়। এছাড়া রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং প্লান্ট এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার মাধ্যমে পানির অপব্যবহার কমানো হয়। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সারভো মোটর স্থাপন, উপযুক্ত পি পি ই'র ব্যবহার, কর্মরত সকল শ্রমিকের নিরাপত্তা প্রদান এবং পরিবেশবান্ধব কারখানা নিশ্চিতকল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নত প্রযুক্তির নান্দনিক সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রম

স্কয়ার ফ্যাশন লিমিটেড শ্রমিকদের পেশাগত রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারখানাটিতে পেশাগত ব্যাধি রোধে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং আক্রান্ত শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া শ্রমিকদের জন্য নানাবিধ চিত্ত বিনোদনের জন্য ইন্টারনেট, খেলার মাঠ (ইনডোর-আউটডোর), সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যায়নরত শ্রমিক ও তাদের সন্তানদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

# স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিমিটেড

বি-৬৫/৩, লাকুরিয়াপাড়া, টুলিভিটা, ধামরাই, ঢাকা।
প্রতিষ্ঠা সাল : ২০১৪, শ্রমিক সংখ্যা : ৮১০১ জন

**মোঃ এস.এম খালেদ**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

"কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা শ্রমিকের আইনগত এবং বৈধ অধিকার" এই বিশ্বাস থেকে স্নোটেক্স আউটওয়্যার লিমিটেড অপরিহার্য বিষয়গুলো পালনে সর্বদা সচেষ্ট। কারখানা ভবনটি বি,এন,বি,সি-২০০৬ এন,এফ,পি,এ ও এন,ই,সি এর বিধান অনুসারে (স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবং ইলেক্ট্রিক্যাল) নির্মাণ এবং স্থাপন করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক কারখানায় নিয়মিত ফায়ার সেফটি কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

কারখানায় সকল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা (প্রাণঘাতি, গুরুতর এবং সামান্য) এবং বিপজ্জনক ঘটনার বিষয়গুলো নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে অবগত করা হয়। কারখানাটির একটি কার্যকর সেফটি কমিটি বিদ্যমান, যার কার্যক্রম কোম্পানীর পাশাপাশি বায়ার ও এ্যাকর্ড কর্তৃক মনিটরিং হয়ে থাকে। চিকিৎসা সুবিধা এবং সেবা কক্ষের সুবিধা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ মৃত শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিকভাবে ও পরিবারের সদস্যদের চাকরির ব্যবস্থা করে থাকেন। ভবিষ্যৎ তহবিল ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

কারখানার পরিবেশ সম্পূর্ণ সিএফসি ফ্রি। কারখানায় কোন প্রকার ক্ষতিকর ক্যামিকেল ব্যবহার করা হয়না। কারখানার আট হাজার শ্রমিক/কর্মচারীর দুপুরের খাবারের বর্জ্যসমূহ কেটিপি দিয়ে পরিশোধনের মাধ্যমে বাইরে নিঃসরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া, কারখানার পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ কমিটি আছে, যারা নিয়মিত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রম

স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিঃ শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের সুবিধা/অসুবিধা এবং প্রত্যাশা সম্পর্কে অবগত হয়ে সুখ জরিপ করে। এছাড়া, শ্রমিক/কর্মচারিদের অনুপস্থিতির হার কমানোর লক্ষ্যে উপস্থিতির হারের উপর বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারখানায় শ্রমিকগণের ছুটি ব্যবস্থা সহজ করার জন্য ওয়ান স্টপ ছুটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। এছাড়া শ্রমিকদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের বিনামূল্যে দুপুরের খাবার সরবরাহ, প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা, সময়মত বেতন প্রদান, উন্নত মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, জিরো ডিফেক্টস অপারেটর পুরস্কার, ভালো কাজের জন্য বিশেষ পুরস্কার ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রের বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিই কারখানাটির শ্রমিকবান্ধব বাংলা গড়ার মূলমন্ত্র।

# হপ লুন এ্যাপারেল লিমিটেড

এস টি টাওয়ার, ০৩ নং ঢাকা ময়মনসিংহ রোড,
পূর্ব গাজীপুরা, টঙ্গী, গাজীপুর।
প্রতিষ্ঠা সাল : ২০০৫, শ্রমিক সংখ্যা : ৬৩২৪ জন

**Suntharalingam Amilthan**
মহাব্যবস্থাপক

## কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

### অপরিহার্য প্রতিপালন

হপ লুন এ্যাপারেল লিমিটেড কারখানাটি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী পরিচালিত একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিতে আইন অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ ও ছুটি প্রদান করা হয় এবং শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত কর্মঘন্টা বাস্তবায়ন করা হয়। শ্রমিকের মৃত্যু, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, অবসান বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চাকরি ছেদজনিত প্রাপ্য পাওনাসমূহ আইনমাফিক পরিশোধ করা হয়। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা প্রদান হয়। কারখানাটিতে সকল প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ শিশু কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে। কারখানার কর্মপরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন। প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স সংরক্ষণ করা হয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে কারখানার নিজস্ব স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। কারখানার স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেকট্রিক্যাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান। অপরিহার্য প্রতিপালনের প্রতিটি বিষয়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারখানায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দায়িত্ব পালনের নজির রয়েছে।

### পরিবেশগত প্রতিপালন

কারখানাটির বিদ্যুৎ/গ্যাস/বি.পি.সি/পরিবেশ/বয়লার/বিএসটিআই/বিএনবিসি/এফএসডি/বিসিআইসি/বিস্ফোরক ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে। কর্মরত শ্রমিকদেরকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। কারখানাটিতে শ্রমিকদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা রয়েছে।

### প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনার ক্ষতি নিরসনে আইনের আলোকে ইন্সুরেন্স এর ব্যবস্থা ছাড়াও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সকল ঝুঁকির জন্য সকল শ্রমিকদের "নিটল ইন্সুরেন্স" এর আওতায় আনা হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় এবং শক্তির অপচয় রোধকল্পে সার্ভে মটর, সেন্সর লাইট, সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পানির অপচয় রোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং প্রেষণা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বনভোজনের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি সকল শ্রমিকদের জন্যে ঈদ উপহার এবং জন্মদিনে উপহার প্রদান করা হয়।

### উদ্ভাবনী কার্যক্রম

নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করার জন্য শ্রমিকদের বিভিন্ন ভাতা যেমন- উৎপাদন প্রণোদনা ভাতা ও নতুন শ্রমিকদের কারখানার পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত করার জন্য একবছর মেয়াদী ভাতা প্রদান করা হয়। বিনামূল্যে দুপুরের খাবার এবং বিকেলের নাস্তা সরবরাহ, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, নাচ ও গানের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, খেলাধুলার আয়োজন, শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়ে থাকে।

# শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তার চেক একজন শ্রমিকের সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মুন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

# জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি

# জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭
# উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন **Country Director, ILO**

# জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭
# উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিসহ মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উপলক্ষে র‍্যালীর একাংশ

# জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের একাংশ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উপলক্ষে র‍্যালীর একাংশ

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের ৫ম সভা

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ এর নতুন ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

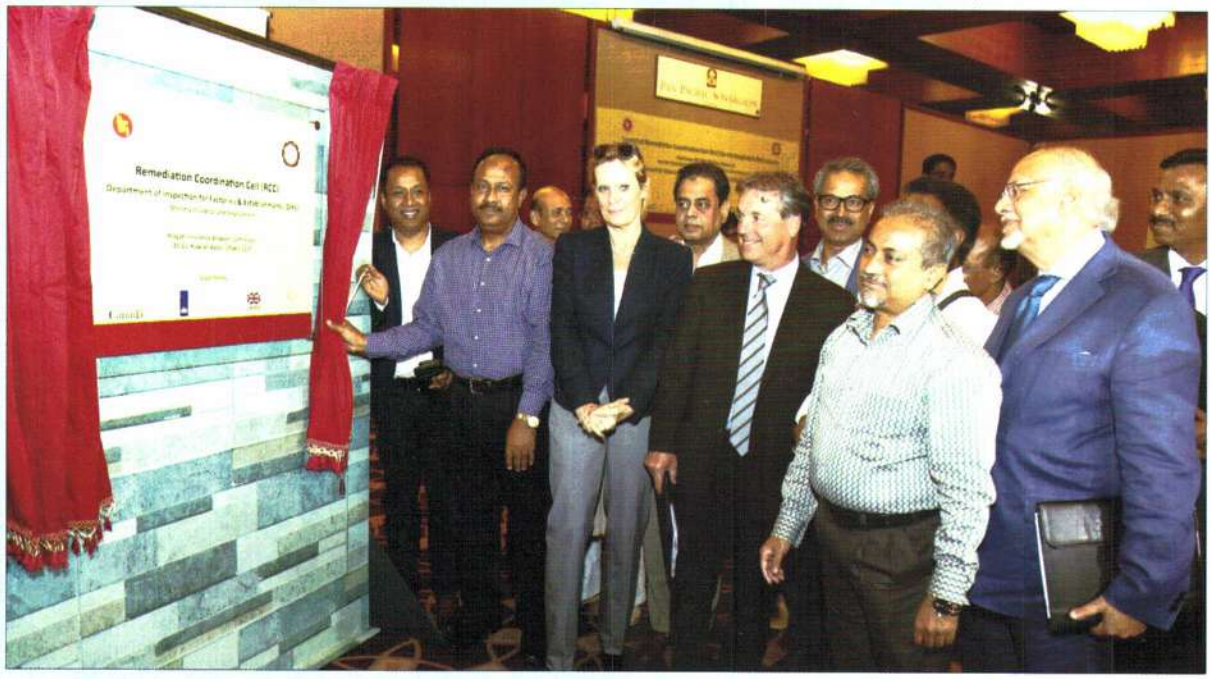


সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি) এর উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

কারখানা মালিকদের সঙ্গে তৈরি পোশাক কারখানার **Remediation** এ অগ্রগতি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণোদনামূলক সম্মাননা প্রদান বিষয়ক সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব এবং সংশ্লিষ্টজন

NYPI সিঙ্গাপুরের অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে মহাপরিদর্শক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে DIFE এবং DOL এর কর্মকর্তাবৃন্দ

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিবের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেলিগেশন

LIMA উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ বিশিষ্টজনেরা

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের হাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত প্রকাশনা তুলে দিচ্ছেন ডাইফ এর মহাপরিদর্শক

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশনের উপর অংশীদারদের আলোচনা

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

ই ফাইলিংয়ে শীর্ষস্থান অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ মহাপরিদর্শকের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আফরোজা খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কর্তৃক চেক হস্তান্তর

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আফরোজা খান

সেইফটি কমিটি সদস্যদের প্রশিক্ষণ সেশন

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের র‍্যালীর একাংশ

স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি উপলক্ষ্যে ডাইফ এর র‍্যালীর একাংশ

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

ডাইফ এর কর্মকর্তাগণের ৬ষ্ঠ ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

**Accident Prevention** বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সনদ হাতে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানাও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

সেইফটি কমিটি প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারী এবং প্রশিক্ষকগণ

বাংলাদেশ শ্রম আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খুলনায় অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ সভা

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানাও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

কম্পিউটার বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণে ডাইফ এর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ শ্রম আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা

# আবাসনে আপনার বিনিয়োগ নিরাপদ হোক

### ফ্ল্যাট বা প্লট কেনার আগে অবশ্যই জেনে নিন

১। ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানটি রিহ্যাব এর সদস্য কিনা?

২। ফ্ল্যাট বা প্লট বুকিং এর আগে জেনে নিন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কিনা?

### ফ্ল্যাট বা প্লট কেনার ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক হিসেবে আপনার কর্তব্য

১। সিডিউল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কিস্তির টাকা পরিশোধ করে ডেভেলপারকে প্রকল্প সমাপ্তিতে সহযোগিতা করুন।

২। সরকারী সিদ্ধান্তে নকশা বা প্রকল্প অনুমোদন কিংবা গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত যৌক্তিক কারণে বিলম্বিত প্রকল্প সমূহ সমাপ্তিতে সহায়তা করুন।

সদস্য ডেভেলপার, ভূমি মালিক ও ফ্ল্যাট/প্লট ক্রেতাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে আপোষ-সমঝোতায় নিষ্পত্তির জন্য "রিহ্যাব মেডিয়েশন এ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিস সেলে" দরখাস্ত করুন।

### ভবন নির্মাণের সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১। প্রকল্প এলাকার বাইরে ফুটপাত বা রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী না রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

২। রাতে সংগৃহীত নির্মাণ সামগ্রী অবশ্যই সকাল ৭ টার মধ্যে ফুটপাত বা রাস্তা হতে প্রকল্প এলাকায় সরিয়ে নিন।

৩। নির্মাণ সামগ্রী, নির্মাণ বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের সময় স্যুয়ারেজ, ড্রেন, ফুটপাত, রাস্তার ক্ষতি না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

### ভবন নির্মাণের সময় দূর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে করণীয়

১। নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই প্রকল্প এলাকাটি নিরাপদভাবে ঘিরে দিন।

২। বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে পথচারী ও নির্মাণ শ্রমিক এর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

৩। নির্মাণকালীন প্রকল্প এলাকায় সার্বক্ষণিক মাথায় হেলমেট, পায়ে জুতা ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সেফটি বেল্ট ব্যবহার করুন।

জনসচেতনতায়...

REHAB

## রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ